কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জানুয়ারী ৮২

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

গর্জে উঠল 'আব্রাহাম লিঙ্কনের' বাষ্পশক্তির ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে জাহাজটি চলতে শুরু করল। অসংখ্য নাগরিক তাঁদের রুমাল নেড়ে অভিনন্দিত করলেন।

গতিবেগ বাড়ল ধীরে ধীরে। ফায়ার আইল্যাণ্ডকে পিছনে ফেলে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' অতলান্তিকের ঘন নীল জলরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

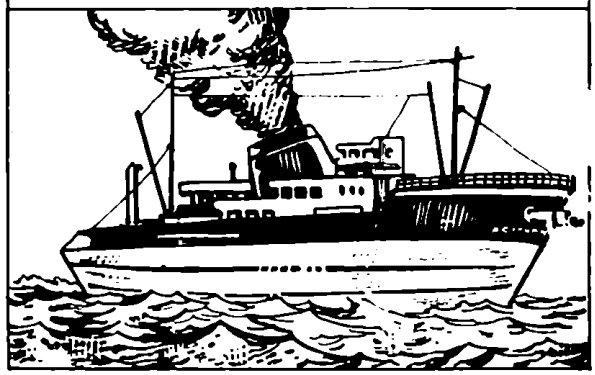

অসংখ্য নাবিক উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ফেনায়িত তরঙ্গপুঞ্জের দিকে। রাসেও তার বিরাম রইলনা।

শুধু গোলা-বারুদ নয়, ক্যাপ্টেন ফারাগুট সাথে নিয়েছিলেন বিখ্যাত এক তিমি-শিকারী নেড ল্যাণ্ডকে।

তুমি এই প্রাণীটার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না কেন নেড? এর পিছনে কি কোন কারণ আছে?

হয়তো আছে মিস্টার অ্যারোন্যাক্স।

একথা কি জান নেড সমুদ্রের ছয় মাইল গভীরে প্রতি বর্গইঞ্চিতে চাপ পড়বে প্রায় পনেরো হাজার পাউণ্ড। একবার চিন্তা করে দেখ ঐ বিশাল জীবটা কী অমিত শক্তির অধিকারী!

একথা ঠিক। কিন্তু চোখে না দেখা পর্যন্ত প্রাণীটার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিনা।

সাতই জুলাই 'আব্রাহাম লিঙ্কন' এসে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরে।

বন্ধুগন, প্রাণীটাকে যে প্রথম দেখাবে তার জন্যে তোলা রইল দু-হাজার ডলার পুরস্কার।

চিঠিপত্র

মহাশয়,

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'পূজা সংখ্যায় ১৩৮৮তে 'প্রাচীন ভারতের গণিতাচার্য' প্রবন্ধে ১৪৯ পৃষ্ঠায়একটি ভুল আছে। সূত্রটি আছে $x \neq \frac{-b = \sqrt{b - 4ac.}}{2a}$

কিন্তু, উহা $\frac{-b \neq \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ হওয়া উচিত, আর ৭৭ পৃষ্ঠায় 'ভেবে করো' (অসিতকুমার চক্রবর্তী) প্রশ্নোত্তরে ২নং প্রশ্নে মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98·6°F দেওয়া আছে। কিন্তু, উহা আমার মতে ভুল, মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98·4°F হয়।

শ্রীসুব্রত ঘোষ
মানকুণ্ড, হুগলী

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনাদের 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার এক নিয়মিত পাঠক। এবারকার পূজাবার্ষিকীও ভাল লাগল। তবে এক জায়গা পড়ে ব্যথিত হলাম। 'তাতুন, কসমস এবং ৯১২ নামক কল্পবিজ্ঞানের গল্পটিতে লেখক কিন্নর রায় নুলিয়ার ছেলেদের 'চিড়িয়াখানার ভোঁদড়' বলে উল্লেখ করেছেন। এটা শুধু সামাজিক শালীনতা বোধের ক্ষেত্রে নয় মানবতা-বোধের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ক্ষতি-কারক। ছোটকে উপেক্ষার মধ্য দিয়ে নয় কোলে টেনে নেওয়ার মধ্য দিয়েই উচ্চের মহত্ব প্রকাশ পায়। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে। সেক্ষেত্রে চিড়িয়াখানার ভোঁদড় বলে উল্লেখ করাটা কি চরম আধুনিকতার নিদর্শন। মানব সন্তানকে পশুর সাথে উপমা দেওয়াটা মোটেই সুস্থ রুচির পরিচয় নয়। তাতুনের মধ্যে দিয়ে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে সেটাও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধাদায়ক। আশাকরি এরকম নামী পত্রিকায় এ ত্রুটি সংশোধিত হবে।

সুজয় মৈত্র
সপ্তম শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল

ভাই সুজয় মৈত্র,

আপনার চিঠি পেয়েছি।

চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। নুলিয়াদের ভোঁদড় বলার এতটুকুও ইচ্ছে আমার নেই, ছিলো না। ওটা স্রেফ উদাহরণের জন্যে। কাউকে ছোট করতে চাইনি ভাই।

এর জন্যে যদি আপনি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তা একান্তই আমার অনিচ্ছায় ঘটেছে। ভবিষ্যতে যাতে এমনটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব।

কিন্নর রায়

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় ঃ ২
চিঠিপত্র ঃ ১
দপ্তর থেকে
খেলোয়াড় এবং বিজ্ঞান ঃ সমরজিৎ কর ৩
উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ১৪
গল্প
ঝন্টু মামার ছিপ ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ ৪৩
পড়াশোনা
উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি ঃ নন্দলাল মাইতি ১৭
আলোকেরই ঝরণা ধারায় ঃ ডঃ অলক চক্রবর্তী ২৭
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ঃ তারকমোহন দাশ ৩৫
রসায়নের সহজপাঠ ঃ অমরনাথ রায় ৫
ছবিতে গল্প
অজানা মহাকাশে ঃ দেবদাস ২০
খুদে বৈজ্ঞানিক ঃ দিলীপ দাস ২৪
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ঃ দিলীপ দাস ২৬
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ঃ ধীরেন বল ৫৬
আবিষ্কারের গল্প
ম্যালেরিয়া রহস্য ঃ বিবেক রায় ৩৮
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
স্টিরিওফোনিক শব্দ কাকে বলে ? ঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ২১
মাকড়সার জগৎ ঃ অশোককান্তি সান্যাল ৩০
মাটি থেকে আকাশে ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪০
বিজ্ঞানের বিস্ময়
কোমোডো দ্বীপের ড্রাগন ঃ অমিতাভ সেন ৯
বিজ্ঞান বিচিত্রা ঃ অনীশ দেব ১১
নবনালন্দায় বিজ্ঞান মনস্কতা ঃ কিন্নর রায় ২৫
বিজ্ঞান সংবাদ ১০ ঃ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ১৯
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৩৪, ৩৯
ছোটদের দপ্তর
জীবন্ত ফসিল ঃ প্রদীপ্ত সরকার ৪৯
প্রশ্নোত্তর ঃ ৫০ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান ঃ ৫১
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ঃ বৈজ্ঞানিক ৫১
বিজ্ঞানের শব্দকূট ঃ স্বাতী রায় ৫১
ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ঃ সহদেব ভট্টাচার্য ৫২
ভেবে ভেবে বল ঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী ৫৩
করে দেখ মজা পাবে ঃ দেবাশিষ কর্মকার ৫৪

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা। জানুয়ারি ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বসু
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

জানুয়ারি সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর সংগে সংগে অনেক নতুন বইও তোমাদের হাতে পৌঁছবে এই জানুয়ারি মাসেই। বছরের গোড়া থেকেই কিন্তু তোমরা রুটিন মাফিক পড়াশোনা শুরু করে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে উঠলে—তাদের জন্য আমরা রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছি এ মাস থেকেই। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ ১৯৮২।

আর ১৯৮২ এপ্রিলের গোঁড়ায় যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছ, তাদের জন্য ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সতর্কতামূলক নির্দেশসহ পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য থাকছে কয়েকটি মূল্যবান রচনা, যা অনিবার্যভাবেই তোমাদের কাজে লাগবে।

১৯৮২ শিক্ষাবর্ষের জন্য কয়েকটি বই

জীবন বিজ্ঞান (১ম/ষষ্ঠ শ্রেণী, ২য়/সপ্তম শ্রেণী)
মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান (১ম/নবম শ্রেণী, ২য়/দশম শ্রেণী)
ড: ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ড: অসীম চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস (ষষ্ঠ শ্রেণী)

মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত (সপ্তম শ্রেণী)

আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত (দশম শ্রেণী)
কল্যাণ চৌধুরী

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান
ড: রণজিত দাস ও ড: বিদ্যুৎ গুপ্ত

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য্য সেন স্ট্রীট কলি:—৭০০০৯ ফোন-৩৫-৪৫৩৪

দপ্তর থেকে

খেলোয়াড় এবং বিজ্ঞান

সমরজিৎ কর

কথাটা শুনে তোমরা হয়ত ভাবছ, সেকি ? খেলোয়াড়ের সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক ?

সম্পর্কটা যে কী, দু একটা উদাহরণ দিই, তাহলেই বুঝতে পারবে।

যেমন ধর, অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর দৌড়বাজ রন ক্লার্কের কথা। মেকসিকো সিটিতে বসেছে অলিম্পিক খেলার আসর। সেটা ১৯৬৮। গ্রীক পুরাণের বীর একিলাসের মত ১০০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রবল বিক্রমে ছুটে চলছিলেন রন ক্লার্ক। তাঁর ক্ষীপ্রগতি এবং তার সঙ্গে পা ফেলার অপূর্ব কায়দা দেখে হাজার হাজার দর্শক রীতিমত মুগ্ধ। রন ছুটছেন। প্রায় সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন তিনি। বিজয় সীমায় পৌঁছে গেলেন বলে। কিন্তু হঠাৎ। কী যে হলো। পেছিয়ে পড়লেন তিনি। এক এক করে পাঁচজনের পেছনে। অবশেষে শেষ প্রান্তে এসে এক খণ্ড পাথরের মত পথের উপরই ছিটকে পড়ে গেলেন তিনি। প্রতিযোগিতায় তাঁর ভাগ্যে জুটলো ষষ্ঠ স্থান।

রন তখন পুরোপুরি অবসন্ন। সংজ্ঞাও হারিয়েছেন। ডাক্তার এলেন। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলেন, দৌড়ের ধকল সামলাতে গিয়ে তাঁর দেহপেশী প্রায় পুরোপুরি ক্ষমতা হারিয়েছে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাকমুখের উপর চেপে ধরলেন অক্সিজেনের ঠুঙ্গি। হ্যাঁ, জ্ঞান ফিরলো। কয়েক মিনিট পর। কিন্তু পথ চলার ক্ষমতা পেতে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

খেলতে গিয়ে এমন কত রকম ঘটনাই ঘটে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্যে নতুন একটি বিজ্ঞানই তৈরি হয়েছে। ইংরেজিতে এই বিজ্ঞানকে বলা হয় 'স্পোর্টস মেডিসিন'। বাংলায় ক্রীড়াবিজ্ঞান। খেলতে গিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু নিশ্চয় কেউ চান না তেমনটি ঘটুক। যদিও বা ঘটে, কিভাবে তার প্রতিকার করা যায় তার জন্যে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা। আর তা করতে গিয়ে চিকিৎসককে নানা রকম খেলার কায়দা কানুন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হতে হয়। জানতে হয় খেলোয়াড়ের শারীরবৃত্তীয় অবস্থা, দৈহিক ক্ষমতা। কেউ হয়ত পোল ভল্ট দেবে। পোল ভল্ট দেবার সময় তার দেহের পেশীতে কোথায় টান পড়তে পারে, পায়ের হাড় মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় তার ভার সহ্য করতে পারবে কিনা, তার দম কতটা যাতে করে সে তার দেহের ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে, অথবা লাফ দেওয়ার সময় দেহের কায়দা কেমন রাখলে অনায়াসে কাজটি সারা যায়—এমন সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় যাঁরা ক্রীড়া চিকিৎসক তাঁদের। এ ছাড়া খেলোয়াড়ের দৈহিক পুষ্টি, মানসিক চাপ, শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কি ধরনের ধকল পড়তে পারে এ সব ব্যাপারেও তাঁদের অভিজ্ঞ হতে হয়।

উদাহরণ দিই, কেমন? ধরো 'টেনিস এলবো'। শব্দটি ইংরেজি। যাঁরা লন টেনিস খেলেন তাঁরা জানেন শব্দটির মানে কি। লন টেনিস খেলার সময় কোন অসতর্ক মুহূর্তে বল পিটুতে গিয়ে ব্যাটসুদ্ধ হাতটা

বেকায়দায় সামনে ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে গেল। মনে হলো, কনুই থেকে হাতের সামনের অংশ এই বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কনুইয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। এ ধরনের ব্যাপার-টাকেই বলে 'টেনিস এলবো'। এমন ঘটনা ঘটলে

খেলোয়াড়কে অনেক সময় বেশ কিছুদিন খেলা ছেড়ে বসে থাকতে হয়।

অথবা ধরো, 'পাঞ্চ ড্রাংকেননেস'। বা ঘুষির মাতলামো। বক্সারদের বেলায় এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। রিং-এর মধ্যে চলছে দুই বক্সারে তুমুল লড়াই। দুজনই মরিয়া। ঘুষির দাপটে পাগল। হঠাৎ কোন অসতর্ক মুহূর্তে এক-জনের প্রচণ্ড ঘুষি গিয়ে পড়ল আর একজনের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে সরষের ফুল। মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে। চোখ ঘোলাটে। মাতালের মত কাঁপছে তার সমস্ত শরীর। এই অবস্থাকেই বলা হয় 'পাঞ্চ ড্রাংকেননেস'। নিউরোলজিস্টদের (যাঁদের কাজ মস্তিষ্কের স্নায়ু নিয়ে চিকিৎসা করা।) কাছে এ ধরনের ঘটনা অনেক সময় বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

ফুটবল খেলতে গিয়ে অনেকে বল ধরতে হাঁটুর ডগা কাজে লাগায়। প্রতিপক্ষ থেকে প্রচণ্ড গতিতে শট্ এলো। স্টপার শট্‌টি হাঁটু দিয়ে থামানোর চেষ্টা করলো। আর অমনি বিপত্তি। বেকায়দায় হাঁটু ছুঁড়তে গিয়ে টান পড়ল হাঁটুর সংযোগস্থলের রগে। ছিঁড়ে গেল রগ। অথবা টুকরো হয়ে গেল মালাইচাকি। এসব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু কে করবেন এই অস্ত্রোপচার? একজন সাধারণ শল্যচিকিৎসকের পক্ষে এ কাজটি করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। কারণ এ ধরনের কাটাছেঁড়া করতে গেলে দুটি কথা সব সময় মনে রাখতে হয়। শরীরের যে অংশে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে, খেলোয়াড়ের কাছে সে অংশটি খুবই মূল্যবান। তিনি যা খেলেন সেই খেলায় ওই বিশেষ অংশটির ভূমিকা কি যিনি অস্ত্রোপচার করবেন তাঁর সেটা জানা দরকার। এ ছাড়া অস্ত্রোপচারের পর খেলোয়াড় হিসেবে যাতে সে মাঠে নামতে পারে, খেলার যোগ্যতা তার বজায় থাকে সে দিকেও নজর রাখতে হয়।

শুধু খেলোয়াড় কেন, এক সময়ে কেউ হয়ত খেলোয়াড় ছিল। পরবর্তী জীবনে তায় চিকিৎসা চালাতে গিয়ে কি কম বিপদে পড়েন ডাক্তাররা?

বছর পঁচিশ আগের ঘটনা। এক ভদ্রলোক এলেন জনৈক চিকিৎসকের কাছে। বললেন, বুকে মাঝে মাঝে বড় যন্ত্রণা হয়, ডাক্তারবাবু।

তাঁর কথা শুনে চিকিৎসক তাঁর বুক পরীক্ষা করলেন। এক্স-রে ছবিও তোলা হলো তাঁর বুকের। আর সেই ছবি পরীক্ষা করতে গিয়ে চিকিৎসকের তো দুচোখ কপালে ওঠার অবস্থা। কি সর্বনাশ! মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড এত বড় হয় কি করে? খুব গোলমালে পড়লেন তিনি। ভাবলেন, মস্ত এই হৃদ্‌পিণ্ডটিই যন্ত্রণার কারণ। অস্ত্রোপচার করলেই হয়ত জ্বালা যন্ত্রণা মিটে যাবে। তবে এ হলো গিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের উপর ছুরি চালানো। নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে হাত দেওয়া উচিৎ।

তাই চিকিৎসক ভদ্রলোকটি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললেন।

বন্ধু মন দিয়ে সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কী করে?

কী করে মানে? জিজ্ঞেস করলেন ওই চিকিৎসক।

মানে, পেশা কি তার।

তা তো জানি না?

সেকি, সেটাই জিজ্ঞেস করনি?

রোগীকে ডাকা হলো। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। স্বাস্থ্য ভালো। তিনি জানালেন, পেশায় তিনি খেলোয়াড়। দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রচুর ট্রফি জিতেছেন তিনি। নাম বলতেই বন্ধু ডাক্তারটি তাঁকে চিনলেন। খেলোয়াড়দের খবরাখবর রাখতেন তিনি। অনেকের চিকিৎসাও করেছেন, ফলে ব্যাপারটা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না।

বন্ধুকে বললেন, যাঁরা নিয়মিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, অভিযোজনের দরুন তাদের হৃদ্‌পিণ্ড সাধারণ মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড থেকে বড় হয়। তারা যে বড় হৃদ্‌পিণ্ড নিয়ে জন্মায় সেকথা বলবো না। আসলে নিয়মিত দৌড়ের দরুন[illegible]মনটি হয়ে থাকে।

চিকিৎসক এবার তাঁর ভুল বুঝলেন। বড় হৃদ্‌পিণ্ড থেকে এর আগে তাঁর অন্য কোন কথা মনেই আসে নি। এবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রোগীকে পরীক্ষা করলেন তিনি। এবং অবশেষে আবিষ্কার করলেন, বিশেষ এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণের দরুনই সে অসুস্থ হয়। সেটা তার রক্ত পরীক্ষা করতেই ধরা পড়ল। হৃদ্‌পিণ্ডের আয়তন তার জন্যে দায়ী নয়। অতএব বুঝতেই পারছো ক্রীড়া চিকিৎসকের দায়িত্ব কত বেশি?

বলতে কি, যে কোনো খেলাতেই এখন বিজ্ঞানের প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সাহায্যে খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বাড়ান যায়। তার নিরাপত্তাও রক্ষা করা যায়। এখন শীত চলছে। এই সময়ে কত রকম খেলাই না তোমরা খেলছ। তাই বলছিলাম, সেই খেলার ফাঁকে সময় সময় চিকিৎসকের সাহায্য নেবে। এতে দেখবে, তোমরাও উপকৃত কম হবে না।

রসায়নের সহজপাঠ

অমরনাথ রায়

রাসায়নিক সমীকরণ, জারণ, বিজারণ

জারণ সংখ্যা নির্ণয়।

আগের অধ্যায়ে রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করার অন্যান্য পদ্ধতিগুলির বিষয় আলোচিত হবে।

রাসায়নিক সমীকরণ ব্যালান্স করার আংশিক সমীকরণ পদ্ধতি (Partial equation method) :

বিকারক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থে যদি বহু অণু বর্তমান থাকে এবং একরকম মৌলের পরমাণু যদি একাধিক অণুর মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহ'লে সমীকরণকে ব্যালান্স করতে অসুবিধা হয়। এই রকম জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে :

(i) বিক্রিয়া ঘটে একাধিক পর্যায়ে ও আংশিকভাবে।

(ii) আংশিক বিক্রিয়াগুলির সমীকরণ আলাদাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যালান্স করা হয়।

(iii) প্রথম আংশিক বিক্রিয়ায় যে সব নতুন অণু বা বিক্রিয়াজাত অণু পাওয়া যায়, পরের আংশিক বিক্রিয়ায় সেগুলি বিকারকের কাজ করে।

(iv) এইভাবে যতগুলি আংশিক বিক্রিয়া হয়, সেগুলিকে পরপর লেখা হয়। বিক্রিয়াগুলির বাঁ দিকে এবং ডান দিকে একই রকম সমসংখ্যক অণুগুলি কাটাকাটি করে সমীকরণগুলি যোগ করতে হয়। এইভাবে যে যোগফল পাওয়া যায়, তা-ই চূড়ান্ত সুসমঞ্জস সমীকরণটিকে নির্দেশ করে।

উদাহরণ : (i) সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো ফেরাস সালফেট দ্রবণে ক্লোরিন গ্যাস চালনা করলে ফেরিক সালফেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$FeSo_4 + H_2So_4 + Cl_2 \rightarrow Fe_2(So_4)_3 + HCl$

প্রথম আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $H_2O + Cl_2 = 2HCl + O$

দ্বিতীয় আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $2Fe\,So_4 + H_2So_4 + O = Fe_2(So_4)_3 + H_2O$

যোগ করে : $2FeSo_4 + H_2So_4 + Cl_2 = Fe(SO_4)_3 + 2HCl$

উদাহরণ (2) : গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারকে উত্তপ্ত করার ফলে কপার সালফেট, সালফার ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

$Cu + H_2So_4 \rightarrow CuSo_4 + So_2 + H_2O$

প্রথম আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $Cu + H_2So_4 = CuO + So_2 + H_2O$

দ্বিতীয় আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $CuO + H_2So_4 = CuSo_4 + H_2O$.

যোগ করে : $Cu + 2H_2So_4 = CuSo_4 + SO_2 + 2H_2O$,

উদাহরণ (3) : নাতি গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কপার নাইট্রেট, নাইট্রিক অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

প্রথম আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $Cu + 2HNo_3 = Cu(No_3)_2 + 2H$

দ্বিতীয় আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $HNo_3 + 2H = HNo_2 + H_2O$

তৃতীয় আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ : $3HNo_2 = HNo_3 + 2No + H_2o$

প্রথম ও দ্বিতীয় আংশিক সমীকরণকে 3 দিয়ে গুণ ক'রে তৃতীয় আংশিক সমীকরণের সঙ্গে যোগ করলে দাঁড়ায় :

$3Cu + 6HNo_3 = 3Cu(No_3)_2 + 6H$
$3HNo_3 + 6H = 3HNo_2 + 3H_2O$
$3HNo_2 = HNo_3 + 2No + H_2O$

$3Cu + 8HNo_3 = 3Cu(No_3)_2 + 2No + 4H_2O$,

এইটিই সুসঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ।

উদাহরণ (4) : পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেন পাওয়া যায়।

প্রথম আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ :—

$4Kclo_3 \rightarrow 3Kclo_4 + Kcl$.....(i)

দ্বিতীয় আংশিক বিক্রিয়ার সমীকরণ :—

$3Kclo_4 = 3Kcl + 6o_2$..... (ii)

এখন (i) এবং (ii) কে যোগ করলে পাওয়া যায় ;

$4Kclo_3 = 3Kclo_4 + Kcl$
$3Kclo_4 = 3Kcl + 6o_2$

$4Kclo_3 = 4Kcl + 6o_2$ (সুসমঞ্জস সমীকরণ)

জারণ সংখ্যার সাহায্যেও রাসায়নিক সমীকরণকে ব্যালান্স করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি আলোচনার আগে জেনে নেওয়া দরকার, জারণ মাত্রা (Oxidation State), জারণ-সংখ্যা (Oxidion Number) ও জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি।

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন পরমাণু বা আয়ন থেকে

এক বা একাধিক ইলেকট্রন অপসারিত হয়, তাকে জারণ বলে। অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু বা আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা কমে গেলে বলা হয় যে, পরমাণুটি বা আয়নটি জারিত হয়েছে।

জারণের উদাহরণ ঃ

সোডিয়াম পরমাণু (e) ত্যাগ করে জারিত হয়ে সোডিয়াম আয়নে (Na^+) পরিণত হয়।

$$Na - e = Na^+$$

ক্যালসিয়াম পরমাণু ইলেকট্রন (e) ত্যাগ ক'রে জারিত হ'য়ে ক্যালসিয়াম আয়নে (Ca^{++}) পরিণত হয়।

আবার অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু ইলেকট্রন (e) ত্যাগ করে জারিত হ'য়ে অ্যালুমিলিয়াম আয়নে (Al^{+++}) পরিণত হয়।

ফেরাস আয়ন (Fe^{++}) ইলেকট্রন ত্যাগ ক'রে জারিত হ'য়ে ফেরিক আয়নে (Fe^{+++}) হয়।

$$Fe^{++} - e = Fe^{+++}$$

আবার স্ট্যানাস আয়ন (Sn^{++}) ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়ে স্ট্যানিক আয়নে (Sn^{++++}) পরিণত হয়।

$$Sn^{++} - 2e = Sn^{++++}$$

এ ভিন্ন ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, সালফাইড, প্রভৃতি অ্যানায়গুলি (নেগেটিভ, তড়িৎ আধানযুক্ত আয়নগুলি) ইলেকট্রন ত্যাগ ক'রে জারিত হ'য়ে অধাতব মৌলে পরিণত হয়।

যেমন ঃ $2Cl - 2e = Cl_2$, $2Br - 2e = Br_2$

$$S^{=} - 2e = S$$

এ সবই জারণ ক্রিয়ার ইলেকট্রনীয় মতবাদ। এবারে বিজারণের ইলেকট্রনীয় মতবাদের কথায় আসা যাক।

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু ও আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বিজারণ বলে। অর্থাৎ, কোন পরমাণু বা আয়নের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়লে বলা হয় যে, পরমাণু বা আয়নটি বিজারিত হয়েছে।

বিজারণের উদাহরণ ঃ

সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়ন বা ক্যাটায়ন। সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন (e) গ্রহণ করে বিজারিত হ'য়ে ধাতব সোডিয়ামে (Na) পরিণত হয়।

$$Na^+ + e = Na$$

অনুরূপভাবে, কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{++}) ইলেকট্রন (e) গ্রহণ ক'রে বিজারিত হ'য়ে ধাতব কপারে পরিণত হয়।

$$Cu^{++} + 2e = Cu$$

ফেরিক আয়ন (Fe^{+++}) ইলেকট্রন গ্রহণ ক'রে বিজারিত হ'য়ে নিম্নতর যোজ্যতার ফেরাস আয়নে (Fe^{++}) পরিণত হয়।

$$Fe^{+++} + e = Fe^{++}$$

আবার, স্ট্যানিক আয়ন (S^{x++++}) ইলেকট্রন গ্রহণ ক'রে বিজারিত হয়ে নিম্নতর যোজ্যতার স্ট্যানাস আয়নে (Sn^{++}) পরিণত হয়।

এ ভিন্ন ক্লোরিন, ব্রোমিন,, অক্সিজেন, প্রভৃতি পরমাণু গুলি ইলেকট্রন (e) গ্রহণ ক'রে বিজারিত হ'য়ে যথাক্রমে ক্লোরাইড (Cl^-), ব্রোমাইড (Br^-), অক্সাইড ($O^=$) আয়নে পরিণত হয়।

$$Cl + e \rightarrow Cl^-$$
$$Br + e \rightarrow Br^-$$
$$O + 2e \rightarrow O^=$$

জারণ ও বিজারণের এই ইলেক্ট্রনীয় মতবাদ জানার পর জারণ-মাত্রা (Oxidation State) প্রসঙ্গে আসা যাক।

জারণ-মাত্রা ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে বা পরে কোন মুক্ত পরমাণু বা যৌগের মধ্যে কোন পরমাণু জারণ বা বিজারণের যে অবস্থায় থাকে তাকে ঐ পরমাণুর 'জারণ-মাত্রা' বলে।

উদারহণ ঃ $H_2 + Cl_2 = 2HCl$

এখানে বিক্রিয়ার আগে H এবং Cl পরমাণু মুক্ত অবস্থায় নিস্তড়িৎ থাকে, অর্থাৎ শূন্য (0) জারণ মাত্রায় থাকে। এই দুই পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটলে H পরমাণুটি ইলেকট্রন (e) বর্জন করে H^+ (হাইড্রোজেন আয়নে) জারিত হয় এবং Cl পরমাণু ঐ বর্জিত ইলেকট্রন গ্রহন ক'রে Cl আয়নে (ক্লোরাইড আয়নে) বিজারিত হয়ে HCl যৌগটি উৎপন্ন করে। তাহলে বিক্রিয়ার পরে HCl যৌগে H-এর জারণ-মাত্রায় পরিবর্তন হয় 0 শূন্য থেকে (+1) এবং Cl পরমাণুর জারণ মাত্রার পরিবর্তন হয় O (শূন্য) থেকে (−1) এ।

কোন পরমাণু যখন ইলেকট্রন বর্জন করে তখন পরমাণুটি জারিত হয়ে 'ক্যাটায়নে' পরিণত হয়। আবার কোন পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে পরমাণুটি 'অ্যানায়নে' পরিণত হ'য়ে বিজারিত হয়। **ক্যাটায়নটি হলো পরমাণুর জারিত অবস্থা এবং অ্যানায়নটি হলো পরমাণুর বিজারিত অবস্থা। মুক্ত অবস্থায় যে কোন পরমাণু শূন্য (0) জারণ অবস্থায় থাকে বলে ধরা হয়।**

জারণ সংখ্যা ঃ মুক্ত অবস্থায় কিংবা কোন যৌগের

মধ্যে কোন পরমাণুর জারণ-মাত্রাকে যে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়, সেই সংখ্যাটিকে ঐ পরমাণুর জারণ সংখ্যা (Oxidation Number) বলে।

এই সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় :—একটি যৌগের মধ্যেকার কোন পরমাণুকে নিস্তড়িৎ পরমাণুতে পরিণত করার জন্যে যে কটি ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করা দরকার, সেই সংখ্যাটি হলো ঐ পরমাণুর ঐ অবস্থার জারণ সংখ্যা।

উদাহরণ : ফেরাস লবণে আয়রনের (Fe^{++}) জারণ সংখ্যা (+2), কারণ 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে Fe^{++} আয়ন নিস্তড়িৎ আয়রনে পরিণত হয়।

ফেরিক লবণে আয়রনের জারণ সংখ্যা (+3), কারণ Fe^{+++} আয়ন তিনটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে নিস্তড়িৎ আয়রনে পরিণত হয়। $Fe^{+++} + 3e = Fe$

ক্লোরাইড যৌগে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা (−1), কারণ Cl আয়ন থেকে একটি মাত্র ইলেকট্রন বর্জিত হলে ক্লোরাইড আয়নটি (Cl^-) নিস্তড়িৎ ক্লোরিন পরমাণুতে (Cl) পরিণত হয়।

জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার নিয়ম :

(i) মুক্ত অবস্থায় পরমাণুর জারণ সংখ্যা সব সময় শূন্য (0) ধরা হয়। কারণ এই অবস্থায় পরমাণুটি নিস্তড়িৎ অবস্থায় থাকে। H_2^0 ; Mg^0 ; Cl_2^0

(ii) ধাতব হাইড্রাইড ছাড়া অন্যান্য হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগে H-এর জারণ সংখ্যা (+1) ধরা হয়। ধাতব হাইড্রাইডে H-এর জারণ সংখ্যা (−1)।

যেমন, $NaH \rightarrow Na^+ + H^-$ [এখানে H এর জারণ সংখ্যা (−1)] আবার $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ [এখানে H-এর জারণ-সংখ্যা (+1)]

(iii) ধাতুর জারণ-সংখ্যা ধনাত্মক ধরা হয়।

যেমন, $CuO \rightarrow Cu^{++} + O^=$

এখানে, Cu এর জারণ সংখ্যা (+2)

(iv) H_2 ছাড়া অক্সিজেন এবং জারণ-সংখ্যা সাধারণত ঋণাত্মক হয়। যৌগের মধ্যে O_2 এর জারণ সংখ্যা (−2) হয়।

যেমন, $CuO \rightarrow Cu^{++} + O^=$

যে সব অক্সিজেন ঘটিত যৌগে O_2 এর চেয়ে বেশী তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল থাকে এবং পারঅক্সাইড যৌগে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

যেমন, H O যৌগে H-এর জারণ সংখ্যা (+1) এবং O_2 এর জারণ সংখ্যা (−2), কিন্তু H_2O_2 (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড) যৌগে H-এর জারণ-সংখ্যা (+1) এবং O-এর জারণ সংখ্যা (−1), বেরিয়াম পারঅক্সাইড (BaO_2) যৌগে O-এর সংখ্যা জারণ (−1), ফ্লোরিন মনক্সাইডের (F_2O) অন্তর্গত ফ্লোরিন (F), অক্সিজেনের চেয়ে বেশী তড়িৎ ঋণাত্মক। সেইজন্যে F এর জারণ-সংখ্যা (−1) এবং O-এর জারণ-সংখ্যা (+2)

(v) এক পরমাণুক আয়নের জারণ-সংখ্যা আয়নটির আধানের সমান হয়। যেমন. Na^+, Cl^- ইত্যাদি।

Na^+ আয়নের আধান (+1), জারণ সংখ্যাও (+1)

Cl^- আয়নের আধান (−1), জারণ-সংখ্যাও (−1)

অনুরূপভাবে $Mg^{++} + 2Br^-$ এ Mg^{++}এর আধান (+2) এবং জারণ সংখ্যাও (+2), কিন্তু Br^- এর আধান (−1) এবং এর জারণ-সংখ্যাও (−1)।

(vi) কোন যৌগে সেই যৌগের মধ্যেকার পরমাণু-গুলির জারণ সংখ্যার সমষ্টি সর্বদা শূন্য হয়। যেমন HCl যৌগে H এর জারণ-সংখ্যা (+1) এবং Cl এর জারণ সংখ্যা (−1)। উভয়ের জারণ সংখ্যার সমষ্টি = (+1) + (−1) = 0.

(vii) সমযোজী যৌগদের তড়িৎ বিয়োজন হয় না। সেই জন্যে কাজের সুবিধার জন্যে সমযোজী যৌগগুলিকেও তড়িৎযোজী যৌগরূপে ধরে নিয়ে তার উপাদান-পরমাণু-গুলির জারণ-সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। যেমন, CO_2 যৌগে কার্বন ও অক্সিজেন যথাক্রমে C^{+4} এবং O^{-2} রূপে আছে বলে ধরা হয়। অতএব CO_2 যৌগে C-এবং জারণ-সংখ্যা (+4) এবং O-এর জারণ-সংখ্যা (—2)।

(viii) C, N, S, Cl, Mn প্রভৃতি কয়েকটি মৌলের পরিবর্তনশীল জারণ-সংখ্যা দেখা যায়। যেমন :—

C-এর জারণ সংখ্যা :

$\overset{+4}{CO_2}$; $\overset{-4}{CH_4}$; $\overset{+2}{CO}$; $\overset{-2}{C_2H_4}$; $\overset{-1}{C_2H_2}$

N-এর জারণ সংখ্যা :

$\overset{-3}{NH_3}$; $\overset{-2}{N_2H_4}$; $\overset{+3}{N_2O_3}$; $\overset{+2}{NO}$; $\overset{+4}{N_2O_4}$; $\overset{+5}{N_2O_5}$

$\overset{0}{N_2}$.

S-এর জারণ-সংখ্যা : $\overset{+6}{SO_3}$; $\overset{+4}{SO_2}$; $\overset{-2}{H_2S}$; $\overset{0}{S}$.

Cl-এর জারণ-সংখ্যা : $\overset{-1}{NaCl}$; $\overset{+5}{KClO_3}$; $\overset{+7}{KClO_4}$

Mn-এর জারণ-সংখ্যা :

$\overset{+4}{MnO}$; $\overset{+4}{MnO_2}$; $\overset{+7}{KMO_4}$; $\overset{+6}{K_2MnO_4}$

এই আটটি নিয়মের প্রয়োগ দেখিয়ে নীচে জারণ-

সংখ্যা নির্ণয়ের কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হলো।

(ক) H_3PO_4 যৌগে P-এর জারণ-সংখ্যা নির্ণয়।

এর, H_3PO_4 এ P এর জারণ সংখ্যা = X

$\therefore$ H_3PO_4 এ পরমাণু সংখ্যার যোগফল =
$(+1).3 + X + 4.(-2)$
$= 3 + x - 8 = x - 5$

যেহেতু জারণ সংখ্যার যোগফল = O $\therefore$ $x - 5 = o$
অথবা $x = (+5)$

(খ) $KClO_4$ যৌগে Cl-এর জারণ সংখ্যা নির্ণয়।

ধর, $KClO_4$ এ Cl-এর জারণ-সংখ্যা = x

$KClO_4$ এ পরমাণুগুলির জারণ সংখ্যার যোগফল
$= (+1) + x + 4.(-2)$
$= 1 + x - 8 = (x - 7)$

যেহেতু জারণ-সংখ্যার যোগফল = O
$\therefore$ $x - 7 = O$
অর্থাৎ $x = (+7)$

(গ) C_2H_4 যৌগে C-এর জারণ-সংখ্যা নির্ণয়।

ধর, C_2H_4 এ C-এর জারণ-সংখ্যা = x

$\therefore$ C_2H_4 এ পরমাণুগুলির জারণ-সংখ্যার যোগফল $= 2x + 4(+1) = 2x + 4$

যেহেতু C_2H_4 যৌগের জারণ-সংখ্যার যোগফল = O
সেইহেতু $2x + 4 = O$ অথবা $2x = -4$
অথবা $x = (-2)$

(ঘ) $KMnO_4$ যৌগে Mn-এর জারণ-সংখ্যা নির্ণয়।

ধর, এই যৌগে Mn-এর জারণ সংখ্যা = x

$KMnO_4$ যৌগে পরমাণুগুলির জারণ-সংখ্যার যোগফল $= 1 + x + 4(-2)$.
$= 1 + x - 8 = x - 7$

যেহেতু $KMnO_4$ যৌগের অন্তর্গত পরমাণুগুলির জারণ-সংখ্যার যোগফল = O, সেইহেতু $x - 7 = O$ অথবা $x = (+7)$

(ঙ) H_2SO_4 যৌগে S-এর জারণ-সংখ্যা নির্ণয়

ধর, H_2SO_4 যৌগে S-এর জারণ-সংখ্যা = x

H_2SO_4 যৌগে পরমাণুগুলির জারণ-সংখ্যার যোগফল $= 2(+1) + x + 4.(-2)$

যেহেতু H_2SO_4 যৌগের অন্তর্গত পরমাণুগুলির জারণ-সংখ্যার যোগফল O, সেইহেতু $2 + x - 8 = O$ অথবা $x - 6 = O$ অথবা $x = (+6)$

(চ) $Cr_2O_7^=$ আয়নে Cr-এর জারণ-সংখ্যা নির্ণয়।

ধর এই আয়নের Cr এর জারণ সংখ্যা = x

$Cr_2O_7^=$ আয়নে জারণ-সংখ্যার সমষ্টি =
$2x + 7.(-2) = 2x - 14$

যেহেতু Cr_2O_7 = আয়নের আধান = (—2)

সুতরাং $2x - 14 = -2$ অর্থাৎ $2x = -2 + 14 = 12$
অথবা $x = (+6)$

(ছ) $MnO_4^=$ আয়নে Mn এর জারণ সংখ্যা নির্ণয়।

ধর, Mn এর জারণ-সংখ্যা = x

MnO_4 আয়নে জারণ-সংখ্যার সমষ্টি $= x + 4\ (-2)$
$= x - -8$

যেহেতু $MnO_4^=$ আয়নের আধান = (— 2)

সেইহেতু $x - 8 = -2$ (আয়নের আধান)

অথবা $x = -2 + 8$ $\therefore$ $x = +6$

অর্থাৎ $MO_4^=$ আয়নে Mn এর জারণ-সংখ্যা = (+ 6)

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করার আংশিক সমীকরণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।

2. জারণ-মাত্রা এবং জারণ-সংখ্যা বলতে কি বোঝ?

3. ইলেকট্রনীয় মতবাদ অনুসারে জারণ ও বিজারণের উদাহরণ দাও।

4. জারণ-সংখ্যা নির্ণয় করার বিভিন্ন নিয়মগুলি লেখ।

5. জারণ-সংখ্যার সাহায্যে কিভাবে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করা যায় তা দু'টি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

6. নিম্নলিখিত মৌলগুলির জারণ-সংখ্যা নির্ণয় কর।

(ক) $KMnO_4$ যৌগে Mn-এর

(খ) $CHCl_3$ যৌগে C-এর।

(গ) $NaNO_3$ যৌগে N-এর।

(ঘ) $Na_2S_2O_3$ যৌগে S-এর।

(ঙ) $H_2P_2O_7$ যৌগে P-এর।

(চ) H_3PO_4 যৌগে P-এর।

(ছ) HBr যৌগে Br-এর।

(জ) $KClO_3$ যৌগে Cl-এর।

7. নিম্নলিখিত মৌলগুলির জারণ সংখ্যা (Oxidation State) নির্ণয় কর:

(ক) N_2H_4 যৌগে নাইট্রোজেনের।

(খ) Cl_2O_7 যৌগে ক্লোরিনের।

(গ) $NaNO_2$ যৌগে নাইট্রোজেনের।

(ঘ) F_2H_2 যৌগে ফ্লোরিনের।

কোমোডো দ্বীপের ড্র্যাগন

অমিতাভ সেন

বিরাট টিকটিকির মতো গুটি গুটি এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে লক্ লক্ করে আগুন বেরোচ্ছে মুখ থেকে। গল্প ও লোক-কাহিনীর এই ছবির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায় কোমোডো দ্বীপের একটি প্রাণী যা আজো বেঁচে আছে। তবে সত্যিই তার মুখ দিয়ে আগুন বেরোয় না, বেরোয় উজ্জ্বল কমলা রঙের চেরা-চেরা একটি জিভ। সেইটা দেখেই মানুষ ভুল করে আগুন ব'লে। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটির নাম কোমোডো। মনুষ্যবসতিহীন গভীর অরণ্যে ঘেরা এই দ্বীপে প্রথম যে মানুষ এই ড্র্যাগনটিকে দেখতে পান তিনি এক হতভাগ্য বৈমানিক। ১৯১২ সালে তাঁর প্লেন ভেঙে পড়ে এই দ্বীপে। শ্বাপদসংকুল নির্জন দ্বীপে কয়েক মাস কাটিয়ে তিনি উদ্ধার পান। ফিরে এসে তিনি যখন অগ্নিমুখী ড্র্যাগনদের কথা বলেন সবাই তাঁর কথা উড়িয়ে দেয় মস্তিষ্কের বিকার বলে। যদিও তখন এই নিয়ে হৈচৈ কম হয়নি। ১৯২৭ সালে এক আমেরিকান অভিযাত্রী দল প্রথম এই অতিকায় জন্তুটির ছবি তোলে এবং সারা পৃথিবীর লোক সেই ছবি দেখতে পায়। ফ্রান্সে একটি সিনেমাও ওঠে "কোমোডোর ড্র্যাগন" নামে। বিজ্ঞানীরা বলেন ৫০০ লক্ষ বছর আগে অস্ট্রেলিয়াতে এরকম প্রাণী ছিল, তার কংকাল তাঁরা পেয়েছেন। আসলে এটি নাকি 'মনিটর লিজার্ড' জাতের জন্তু। অনেকটা আমাদের গোসাপের মতো। তবে আকারে এরা অনেক বড় হয়—প্রায় পনের ফুট অবধি। এরপর ১৯৬১ সালে ইন্দোনেশীয় বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেন যে শুধু কোমোডো নয়, কোমোডো সংলগ্ন আরো চারটি দ্বীপে এই প্রাণীরা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এরা সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে এখানে এল কি করে আর এতদিন টিকেই বা গেল কি করে? পৃথিবীর আর কোথাও তো এদের দেখা যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। ইন্দোনেশীয় বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণে চারজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী এলেন সংযুক্ত অভিযান চালাবার জন্যে।

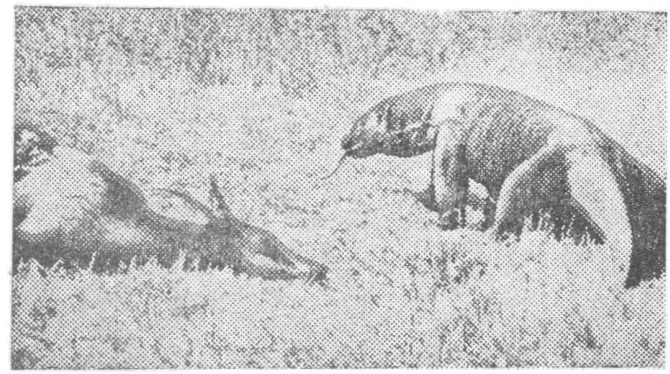

মরা হরিণ খেতে এগিয়ে যাচ্ছে.....

দ্বীপে নামার অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা দুটি 'ড্র্যাগন' দেখতে পান। একটি সাত ফুট লম্বা, অন্যটি তেরো ফুট। খয়েরি কালো রঙের চেহারা, চারটি শক্ত সমর্থ পা, লেজটাকে মাটির ওপর টেনে টেনে হাঁটে। আর দাঁতালো চোয়ালের ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে লকলক ক'রে বেরিয়ে আসে গাঢ় কমলা রঙের চেরা-চেরা জিভটা। আগুন ব'লে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। লেজে এদের দারুণ জোর। লেজের এক ঝটকায় একটা বুনো শুয়োর বা হরিণকে এরা সাবাড় করে দিতে পারে। এক এক কামড়ে শিকারের গা থেকে খুবলে নিতে পারে পাঁচ কিলো ক'রে মাংস। বিজ্ঞানীরা মরা হরিণ এনেছিলেন ওদের টোপ হিসাবে। দুটো তথাকথিত ড্র্যাগনে মিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আশি কিলো মাংস শেষ করে ফেলল—নাড়িভুঁড়ি চামড়া শিং—কিছুই বাদ দিল না। এমনকি তারা চিবিয়ে অবধি খায়নি, শুধু গিলেছে। এরকম একটা মাংসাশী পশুর পেটে বিজ্ঞানীরা একটা বুনো শুয়োরের মাথা পেয়েছিলেন পরে। এরা দেখা গেল নিজেদের শবও খায়। সেই জন্যেই কখনো এদের কংকাল পাওয়া যায়নি। এরা পাখি, ইঁদুর, বুনো শুয়োর ও সাপ খায়। গাছে উঠে বাঁদরদেরও ধরে। পেট ভর্তি থাকলে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাকে কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। অত্যন্ত পেটুক এরা। খাবার লোভ দেখিয়েই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বেশ কটাকে ধরে ফেললেন। কয়েকটা ছেড়ে দেওয়া হল, কয়েকটা গেল ইন্দোনেশিয়ার চিড়িয়াখানায় আর তিনটেকে মাত্র বলি দেওয়া হল বিজ্ঞানের প্রয়োজনে। বিজ্ঞানীরা এদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা করলেন।—জানা গেল, সত্যিই এরা ছিল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী। তবে পৃথিবীর ৫০০ লক্ষ বছরের পুরনো বাসিন্দা হলেও এরা ড্র্যাগন

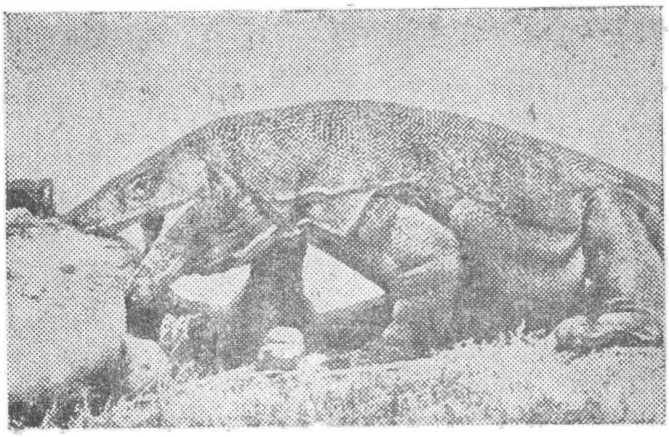

ড্র্যাগনরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আশি কিলো মাংস শেষ করে ফেলল...

বা 'ডাইনোসর নয়। ১৬০ কেজি অবধি এদের ওজন হয়, বাঁচে প্রায় চল্লিশ বছর, মাঝ-গ্রীষ্মে পাঁচটা থেকে পঁচিশটা অবধি ডিম পাড়ে যার আকার হাঁসের ডিমের মতো। একটা 'ড্র্যাগন'কে বিজ্ঞানীরা মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন সাঁতরাতে পারে কিনা দেখবার জন্য। দেখা গেল সাঁ সাঁ করে সাঁতার কেটে সে তীরে এসে উঠে পড়ল। বোঝা গেল অস্ট্রেলিয়া থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাদের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব নয়। একটাই প্রশ্ন বাকী রইল, এরা টিকে গেল কি করে? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, খুব সম্ভবতঃ পরিবেশের জন্য। এখানে মাংসাশী প্রাণী হিসাবে ওদের তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাছাড়া খাদ্যেরও কোন অভাব ঘটেনি কোনদিন। সেই জন্যেই ডাইনোসরের সমকালীন এই জীবটি আজো বেঁচে আছে।

কোমোডো দ্বীপে একটি জীববিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করে বিজ্ঞানীরা এখন এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটি সারা বছর ধরে পর্যবেক্ষণে রাখছেন। শুধু তাই নয়, সংলগ্ন আরো চারটি দ্বীপ সমেত কোমোডোর প্রায় দেড় হাজার ভোজন রসিক 'ড্র্যাগন'-বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য তাঁরা একটি নতুন পদ আমদানী করেছেন—অস্ট্রেলিয়ান খরগোস। কোমোডোর ড্র্যাগনরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুক, আমরাও তাই চাই।

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭

বিজ্ঞান সংবাদ

বৃক্ষ রোপণ—"সাতটি গাছ ও একটি প্রতিজ্ঞা"

সম্প্রতি দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল, সি. এম. ডি. এ-এর সহযোগিতায় কলকাতায় ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ করে। এই প্রজেক্টে বহু স্কুল কলেজ ও উন্নয়নী সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করে। জনবহুল কলকাতা শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপণ-এর কাজ চালানো হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

প্রায় ৬০ শতাংশ গাছ যেমন বকুল, কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস্, শাল প্রভৃতি গাছ সজীব হয়ে বেঁচে উঠেছে। দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী বলেন যে, কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় অনেক তরুণ এগিয়ে আসেন। (নিজস্ব প্রতিবেদক)

ষষ্ঠ নিখিলবঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবির—'৮২

পরিচালনায়ঃ দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ; সহযোগিতায়ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তারিখ ১-৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ; স্থান—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান প্রদর্শনী—প্রযুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞানের গবেষণামূলক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন-মূলক মডেল/প্রজেক্ট প্রতিযোগিতা। ৫০টি পুরস্কার, স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাব যোগদান করতে পারেন।

* **বাংলায় বিজ্ঞান পত্রিকা ও বিজ্ঞান গ্রন্থ** (পুরস্কার নির্বাচন) ৫ কপি পত্রিকা ও ৫ কপি বই লেখক ও সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সমেত ১৫ই জানুয়ারী এর মধ্যে অতি অবশ্যই পাঠাতে হবে। যে সমস্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ হয় নাই, কপি রেখে পাঠাবেন।

* **বিজ্ঞান রচনা/প্রতিযোগিতা/কুইজ/বিজ্ঞানের বক্তৃতা প্রতিযোগিতাঃ** যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী (বিজ্ঞান ও যে-কোন বিভাগ) যোগদান করতে পারেন।

* **গ্রামীণ সম্পদ ও বিকল্প শক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত দু' দিনব্যাপী শিক্ষকদের ও বিজ্ঞান ক্লাব** সদস্যদের জন্য সেমিনার। আবেদনপত্রের জন্য ৫০ পয়সা যুক্ত ডাকটিকিট ও খাম সহ লিখুন। সম্পাদক, দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল ১০৪, ডাঃ হাঃ রোড, ৭০০০০৮ (নিজস্ব প্রতিবেদক)

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

অনীশ দেব

আকর্ষণীয় মাধ্যাকর্ষণ!

পৃথিবীর যে কোন জিনিস ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলেই তা নিচে এসে পড়ে। না, একটু হয়তো ভুল হলো। বায়ুর তুলনায় ভারী কোন জিনিস ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলে তা নিচে এসে পড়ে। ভারি বলতে বায়ুর তুলনায় যে জিনিসের ঘনত্ব (Density) বেশি। যেমন, ইঁট, কাঠ, লোহা, পাথর—এমন কি আপেলও! এইরকম একটা আপেল পড়তে দেখেই বিজ্ঞানী নিউটন ভাবতে শুরু করেছিলেন, কোন্ অদৃশ্য নিয়ম মানতে গিয়ে সব জিনিসই নিতান্ত বাধ্য ছেলের মতো মাটিতে এসে পড়ে। অবশেষে উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। প্রমাণ পেলেন, পৃথিবী স্বয়ং এই অদ্ভুত নিয়মের জন্য দায়ী। তখন তিনি বললেন, সব জিনিসই সব জিনিসকে আকর্ষণ করে। এবং এই বিচিত্র ধর্মের নাম দিলেন মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ। একটা ছোট্ট সূত্র দিয়ে এই বলের (Force) মাপের একটা হিসেব দিলেন নিউটন—যার নামই হলো মহাকর্ষ সূত্র।

$$\text{মাধ্যাকর্ষণ বল} = \frac{G\ M \times m}{r^2}$$

এখানে M হলো পৃথিবীর ভর (Mass), m যে বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে তার ভর, r পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্ব। আর G হলো মহাকর্ষ-ধ্রুবক (Gravitational Constant)।

পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণ বলকেই আমরা বলি অভিকর্ষ (Gravity)। তাহলে ভূপৃষ্ঠে যদি একক ভরের কোন বস্তু রাখা হয়, তাহলে পৃথিবী তাকে কি বলে (Force) টানবে, সেটা আমরা চটপট বের করে ফেলতে পারি মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সাহায্যে।

একক ভরের বস্তুর ওজন এক গ্রাম। পৃথিবীর ওজন, $M = 6 \times 10^{27}$ গ্রাম। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব r যে মোটামুটি ভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান, তা পাশের ছবি থেকেই বুঝতে পারবে। সুতরাং, $r = 6{\cdot}378 \times 10^8$ সেমি। আর, ধ্রুবক G-এর মান $6{\cdot}67 \times 10^{-8}$ সি.জি.এস. একক।

এই সমস্ত মান নিউটনের সূত্রে বসিয়ে দিয়ে সরল করলেই বেরিয়ে পড়বে অভিকর্ষের মান 980 ডাইন (সি, জি. এস পদ্ধতিতে বলের একক)। অর্থাৎ, এক গ্রাম ভরের বস্তুকে পৃথিবী 980 ডাইন বলে টানে।

কোন বস্তুকে শূন্যে স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দিলে সেটা পৃথিবীর দিকে পড়তে শুরু করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রথম সেকেণ্ডে বস্তুটির পড়ার গতিবেগ হবে 980 সেমি/সেকেণ্ড; দ্বিতীয় সেকেণ্ডে 1960 সেমি/সেকেণ্ড। তৃতীয় সেকেণ্ডে 2940 সেমি/সেকেণ্ড। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে বস্তুটির গতিবেগ 980 সেমি/সেকেণ্ড করে বেড়ে যাবে। সোজা কথায় অভিকর্ষজ ত্বরণ Acceleration due to Gravity) ক্রিয়া করবে বস্তুর ওপর, যার মান 980 সেমি/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড। এই ত্বরণকে 'g' অক্ষরটি দিয়ে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়।

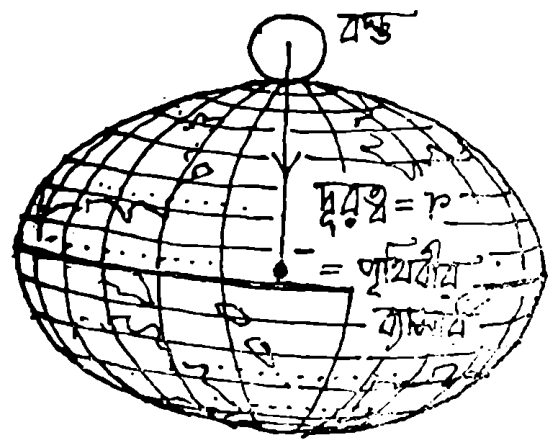

পৃথিবীর অভিকর্ষকে যদি আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই, তাহলে অঙ্ক কষে কয়েকটি অস্বাভাবিক অভিকর্ষের মান বের করে ফেলতে পারি। যেমন, সূর্যের অভিকর্ষ পৃথিবীর আটাশ গুণ। বৃহস্পতি গ্রহের অভিকর্ষ পৃথিবীর 2·64 গুণ। আবার কোন কোন তারার অভিকর্ষ পৃথিবীর হাজার হাজার গুণও হতে পারে। কি করে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অভিকর্ষ হিসেব করা যায়? নিউটনের সূত্র নিয়েই একটু আধটু চেষ্টা করা যাক! আমরা জানি

$$\text{পৃথিবীর অভিকর্ষ} = \frac{G.\ \text{পৃথিবীর ভর} \times 1}{(\text{পৃথিবীর ব্যাসার্ধ})^2} = 980$$

কারণ, অভিকর্ষের হিসেব করতে গেলে যে বস্তুকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে টানছে, তার ভর একক ভর ধরতে হবে। অর্থাৎ, $m = 1$ গ্রাম।

একইভাবে, সূর্যের অভিকর্ষ $= \frac{G. \text{ সূর্যের ভর} \times 1}{(\text{সূর্যের ব্যাসার্ধ})^2}$

এইবার সূর্যের অভিকর্ষকে পৃথিবীর অভিকর্ষ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে,

$$\frac{\text{সূর্যের অভিকর্ষ}}{\text{পৃথিবীর অভিকর্ষ}} = \left(\frac{\text{পৃথিবীর ব্যাসার্ধ}}{\text{সূর্যের ব্যাসার্ধ}}\right)^2 \times \frac{\text{সূর্যের ভর}}{\text{পৃথিবীর ভর}}$$

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তো জানো—একটু আগেই বলেছি। সূর্যের ব্যাসার্ধ হলো, 696×10^8 সেমি। আর সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের 332958 গুণ। সুতরাং ওপরের সমীকরণে এই মানগুলো বসিয়ে দিয়ে হিসেব করলেই দেখবে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে 28 গুণ।

যে কোন অজানা গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ ও ভর জানা থাকলেই তার অভিকর্ষ কতো সেটা তোমরা সহজেই এবার বের করে ফেলতে পারবে। শুধু ওপরে সমীকরণে সূর্যের জায়গায় সেই অজানা গ্রহ অথবা নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ ও ভর বসিয়ে সরল করতে হবে।

তোমরা ঠিক মতো শিখেছ কিনা তার দুটো পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। ধরো, বলে দিলাম, চাঁদের ব্যাসার্ধ 3476×10^5 সেমি, এবং তার ভর পৃথিবীর 0.0123 গুণ। তাহলে হিসেব করে বের করো তো, চাঁদের অভিকর্ষজ ত্বরণ কতো ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হিসেবে তোমরা বৃহস্পতি গ্রহের ভর বের করে ফেলতে পারো। বৃহস্পতির অভিকর্ষ পৃথিবীর কতো গুণ সেটা তো আগেই বলে দিয়েছি। যদি বৃহস্পতির ব্যাসার্ধ 1428×10^7 সেমি বলে দেওয়া হয়, তাহলে আগের পাতার সূত্রের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর খুব চটপট বেরিয়ে পড়বে।

তোমাদের সুবিধের জন্য উত্তর দুটো মোটামুটি দিয়ে দিলাম। এক, চাঁদের অভিকর্ষণ ত্বরণ 163 সেমি/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড। দুই, বৃহস্পতির ভর 1907×10^{27} গ্রাম।

সম্ভব হলে আমাদের সৌর জগতের বাকি সাতটা গ্রহের ব্যাসার্ধ ও ভর জেনে নিয়ে তোমরা তাদের অভিকর্ষের মান বের করে একটা তালিকা বানিয়ে ফেলতে পারো নিজেদের সুবিধের জন্য।

এসব দেখেশুনে কি মনে হয় না, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আকর্ষণের কোন তুলনা নেই!

মাছি! মাছি!

'মুস্কা ডোমেস্টিকা' বললে তোমরা অনেকেই হয়তো কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না, কিন্তু যদি বলি, জিনিসটা নিত্যদিন তোমরা শ'য়ে শ'য়ে দেখে থাকো, তাহলে? যাকে নিয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।' সেই মাছি-মশাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়, যার ভালো নাম 'মুস্কা ডোমেস্টিকা' আর ডাক নাম 'মাছি'।

এইবার যে খবরটা দেবো, সেটা শুনে কিন্তু একটুও অবাক হয়ো না বা চমকে উঠো না। খবরটা হলো, আমাদের এই পৃথিবীতে মোট 85000 রকম মাছি আছে। অবশ্য এই হিসেবের মধ্যে মশার প্রজাতিকেও ধরে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ডানাওয়ালা পোকামাকড়ের সঙ্গে মাছির একটা ছোট্ট তফাৎ আছে। অন্যান্যদের মতো মাছির দু-জোড়া ডানা নেই। তার ডানা মাত্র একজোড়া। তবে অন্যান্য পোকামাকড়দের মতো মাছিও ছোট থেকে বড় হয় অনেক কষ্টে—ধাপে ধাপে। স্ত্রী মাছি ডিম পাড়ে খাবার-দাবারের খুব কাছাকাছি, যাতে ডিম ফুটে বেরিয়ে শূক কীটগুলো ঠিক মতো খেতে পায়। চামড়া যতোদিন নরম থাকে ততোদিন শূক কীটগুলো আকারে বড় হয়। তারপর চামড়া শক্ত হয়ে গেলে যখন আর বাড়তে পারে না, তখন খোলস ছাড়ে। ব্যস, নতুন নরম চামড়া পেয়ে আবার সে বড় হতে থাকে। এই রকম বার কয়েক খোলস ছেড়ে শূক কীট পরিণত হয় মাছিতে।

মাছি যে বেশ তাড়াতাড়ি ওড়ে সে তো তোমরা নিজের চোখেই দেখেছো। কিন্তু সেকেণ্ডে কতো বার সে ডানা নাড়ে, কতো গতিবেগ নিয়ে উড়ে যায় তা কি জানো?

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, পৃথিবীতে প্রথম ডানাওয়ালা পোকামাকড়ের সৃষ্টি হয় আজ থেকে প্রায় তিরিশ কোটি বছর আগে। তখন তাদের ডানাগুলো ছিলো শক্ত, এরোপ্লেনের পাখনার মতো। মোটেই নড়ানো যেতো না ওপর-নিচে। শুধু হাওয়ায় ভর করে এখান থেকে ওখানে লাফিয়ে ভেসে যেতো পোকামাকড়রা। তারপর লক্ষ কোটি বছর ধরে বিবর্তনের পর আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে ডানার চেহারা।

যে মাছি আমরা সব সময় দেখি সেগুলো ডানা নাড়ে সেকেণ্ডে মোটামুটি 200 বার। এটা কি করে মাপা হয় সেটাও শুনে নাও। কোন মাছিকে খুব হালকা কোন সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অনুভূমিক (Horizontal) ভাবে শোয়ানো একটা বড় পাইপের মুখে। তারপর পাইপ দিয়ে পাম্প করে হাওয়া পাঠানো হয় মাছিটাকে লক্ষ্য করে। মাছিটা তখন হাওয়ার ঠেলায় পেছনে সরে যেতে থাকে। কিন্তু সেটা সে বরদাস্ত করবে কেন? সুতরাং নিজের জায়গা বজায় রাখার জন্য মাছিটা ডানা নেড়ে সামনে এগোতে চায়। হাওয়ার গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে মাছির ওড়ার গতিবেগের সমান করে দিলেই মাছিটা শূন্যে একই জায়গায় স্থির হয়ে বিরাট উৎসাহে ডানা নাড়তে থাকে। সে তো আর বুঝতে পারছে না, এভাবে তাকে ঠকানো হচ্ছে।

এইবার উড়ন্ত মাছির ডানায় আলো ফেলা হয় একটা স্ট্রবোস্কোপ (Stroboscope) থেকে। স্ট্রবোস্কোপ হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যা দিয়ে কোন আলোকে খুশি মতো খুব তাড়াতাড়ি জ্বালানো-নেভানো যায় এবং এই জ্বলা-নেভার হার ইচ্ছেমতো পালটানো যায় বিশেষ কায়দায়।

স্ট্রবোস্কোপের আলোর ঝিলিকের কম্পাঙ্ক (Frequency) যদি মাছির ডানা নাড়ানোর হারের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে মনে হবে, মাছিটা যেন আর ডানাই নাড়ছে না। অনড়-অটল হয়ে ডানা দুটো স্থির করে রেখেছে! এটা আর কিছুই নয় আলোর ধাঁধা। সুতরাং স্ট্রবোস্কোপের আলো যদি সেকেণ্ডে 200 বার জ্বলে-নেভে তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। কম্পাঙ্কের সামান্য তফাৎ থাকলেই মনে হবে মাছিটা খুউব আস্তে আস্তে ডানা নাড়ছে। ধরো, তোমার স্ট্রবোস্কোপের আলো জ্বলছে-নিভছে সেকেণ্ডে 198 বার। তাহলে তোমার মনে হবে, মাছিটা সেকেণ্ডে মাত্র দু-বার করে ডানা নাড়ছে!

এরপর পাইপ দিয়ে যে হাওয়া পাঠাচ্ছো, তার গতিবেগ মেপে ফেললেই তুমি মোটামুটিভাবে মাছির গতিবেগ পেয়ে যাবে। পরীক্ষায় সাধারণতঃ দেখা গেছে, মাছির ওড়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 6 কি. মি. কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অল্প দূরত্ব অতিক্রম করার সময়, এই গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় 12 কি. মি. পর্যন্ত হয়।

সুতরাং, তোমাদের যদি কারো ধারণা থেকে থাকে, মাছি খুব তাড়াতাড়ি ওড়ে বা সেকেণ্ডে দু-তিন হাজার বার ডানা নাড়ে, তাহলে সেই ধারণা এবার থেকে শুধরে নিতে পারো। সোজা কথায়, মাছি ও মানুষে যদি গতিবেগের প্রতিযোগিতা হয় তাহলে একটু জোরে হাঁটলেই মাছি হেরে যাবে মানুষের কাছে—তা সে যতো জোরেই ওড়ার চেষ্টা করুক না কেন! অতএব দেখা যাচ্ছে, মাছিকে মিছিমিছি বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়।

আলভা এডিসন: আবিষ্কারের রাজা

রাজা না বলে সম্রাটও হয়তো সহজেই বলা যায় এই বিজ্ঞানীকে। এডিসনের নাম আমরা জানি বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কারক হিসেবে। কিন্তু জেনো রাখো, সারা জীবনে তিনি মোট 1300 আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো দশ দিন অন্তর অন্তর এক একটা নতুন আবিষ্কার করা। এবং তা তিনি পেরেওছিলেন। একসময় তো চার বছরে তিনি 300টা আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। হিসেব করলে দাঁড়ায়, প্রতি পাঁচ দিনে একটা আবিষ্কার।

বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করার আগে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছিলো তাঁকে। তাঁর মনে হয়েছিলো, প্লাটিনাম তার দিয়ে বাল্বের ভেতরের ফিলামেণ্ট তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু প্লাটিনামের তার যে বৈদ্যুতিক তাপ বেশিক্ষণ ধরে সহ্য করতে পারছে না, সেটা যাচাই করতে তাঁকে একটি অক্লান্ত পরিশ্রমের বছর ও আমাদের হিসেবে চার লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছিলো!

বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করার পর এডিসন সরকারী পেটেণ্ট নেন এই আবিষ্কারের। এবং সেই পেটেণ্ট নম্বর ছিলো 222, 898 সংখ্যাটি।

একবার এক নতুন ধরনের সঞ্চয় কোষ (Storage Cell) আবিষ্কার করতে গিয়ে আট হাজার রকম পদ্ধতিতে চেষ্টা করেও এডিসন ব্যর্থ হন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'যাক্, আট হাজার রকম কায়দায় যে হয় না, সেটুকু তো অন্তত জানা গেলো!' সুতরাং এই মহান ব্যক্তিই যে নিচের মন্তব্যটি করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

'প্রতিভা হচ্ছে শতকরা একভাগ অনুপ্রেরণা, আর বাকী নব্বই ভাগ মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা পরিশ্রম।'

শার্লক হোমস এবং চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

অদ্ভুত দর্শন একটা কৃষ্ট্যালের ভেতর মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন শার্লক হোমস ও এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। সেই থেকেই সব ঘটনার শুরু। কৃস্ট্যালের ভেতর দিয়ে সেইসব আশ্চর্য প্রাণীরা উড়ে এসে পৃথিবীতে এসে পড়ল। বিরাট চোঙার মতো চেহারা—তিন পায়ে হাঁটছে।

এই সময়ে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল হোম্‌সের কাছে। বৈদেশিক দপ্তর ও সরকারী তরফের অনুরোধ দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় হোম্‌সকেই দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার। সর্বময় কর্তৃত্ব হোম্‌সের। চিঠি নিয়ে এসেছেন, স্যার পার্সি ফেল্পস। কিন্তু সরকারী কামান বন্দুক যেখানে ব্যর্থ সেখানে হোম্‌স্ কিভাবে মঙ্গলগ্রহীদের প্রতিরোধ করবেন।

মিসেস হাডসন কে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে আসছেন শার্লক হোম্‌স্। আচম্বিতে একটা ছায়া এসে পড়ল চলন্ত ট্রেনের পাশে। জানালার বাইরে আকাশের পানে তাকালো হোম্‌স্। স্থির নিঃশঙ্ক তাঁর দৃষ্টি। উড়ুক্কু মেসিন। এটা কি মঙ্গলগ্রহীদের নতুন অস্ত্র। সবকটা উড়ুক্কু মেসিন মঙ্গল থেকে এসে পড়েছে পৃথিবীতে। প্রাণভয়ে সব মানুষ নিরাপদে আশ্রয়ের খোঁজে কোথায় যে চলে গেছে। লণ্ডন শহর এখন জনশূন্য। শুধু শোঁ-শোঁ সাইরেনের আওয়াজ—আর মঙ্গলের ডাকাতদের তাণ্ডব। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লণ্ডনের পথে আতঙ্কিত ইন্‌সপেক্টর হপকিন্সের সঙ্গে। হোম্‌সের হাতে সময় নেই। এখুনি হপ্‌কিন্স কে পাঠাতে হবে জরুরী চিঠি দিয়ে। কারণ জরুরী তথ্য পাওয়া গেছে মঙ্গল গ্রহীদের আচরণে। লাল ফুলগুলো মরে বাদামী হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। তবে কি সত্যিই পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব?

(১১) হাউ মাউ খাঁউ—মানুষের রক্ত পাঁউ

বাড়ী কাঁপিয়ে দরজা খুলে বন্ধ করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। যেন পাগলা হাতি ঢুকল বাড়ীতে।

আওয়াজ পেয়েই দৌড়ে হল ঘরে নেমে এলেন চ্যালেঞ্জার-গৃহিণী।

"জর্জ, তুমি ঠিক আছো?"

"ঠিক আছি মানে? বোমার মত ফেটে পড়লেন চ্যালেঞ্জার "রীতিমত বেঁচে আছি। আর গবেট স্টেন্ট তার দলবল নিয়ে সাদা পতাকা দেখাতে গিয়ে ছাই হয়ে গেল নীল বিদ্যুতের ছোঁয়ায়। ইডিয়ট কোথাকার।"

শিউরে উঠে মুখে করতল চাপা দিয়ে জর্জ-গৃহিণী বললেন—"কি বলছো তুমি?"

"ঠিকই বলছি। নির্বোধগুলোকে সব বলেছিলাম। আমার কথা কানে তুলল না। তুললে এভাবে মরতে হত না। এক হতভাগা গর্তের ধারে দাঁড়িয়েও খুশী হয়নি—গর্তের ভেতরে নেমে কথা বলতে গিয়েছিল মঙ্গলের জীবদের সঙ্গে। পরিণামটা কি হল জানো?"

"কী?"

"কতকগুলো শূড় বেরিয়ে এসে হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েও আর লাভ হল না। ননসেন্স কোথাকার!"

"আহারে! লোকটার কি হল, তার খোঁজ নিলে না, আর গাল পাড়ছো?"

"তবে না তো কি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবো? বারণ করেছিলাম, শোনেনি কেন?—কি রান্না হয়েছে? ক্ষিদে পেয়েছে—ঝটপট।"

খাবার এল তক্ষুনি। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয় দিয়ে উদরের অগ্নি নিভিয়ে গিন্নিকে সব কথা খুলে বললেন চ্যালেঞ্জার। বললেন, কৃস্ট্যাল দিয়ে অনেক আগেই তিনি মঙ্গলের বাছাধনদের মতলবটা আঁচ করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে বলেননি পাছে ভয় পান। এখন আর অত ভাবনা নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে—ভাবনা শুধু শার্লক হোম্‌স্‌কে নিয়ে। সে বেঁচে আছে তো? বৈজ্ঞানিকগুলো সাবাড় হয়েছে—তাতে দেশের অমঙ্গল খুব একটা হবে না। কিন্তু শার্লক হোম্‌স্ ম'লে সারা পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে এহেন কথাবার্তায় রাগ করে উঠে গেলেন প্রফেসর গৃহিণী। কৃস্ট্যাল নিয়ে বসলেন প্রফেসর। মাথায় কালো কাপড় চাপা দিতেই দেখলেন,

কতকগুলো ধাতুর রডকে লিকপিকে শুঁড় দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে মঙ্গলের বিকটদেহীরা। অর্থাৎ, নতুন অস্ত্র তৈরী হচ্ছে।

ফোন করলেন হোমসকে। সাড়া পেলেন না। তার পরের দিনও না। তার পরের দিন বিশেষ দূত মারফৎ একটা চিঠি এসে পৌঁছোলো। হোমস্ জীবিত। কিন্তু লণ্ডনে এখন নেই।

স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলেন চ্যালেঞ্জার। হোমস্ আর তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর মূল্যবান মস্তিষ্কের অধিকারী কেউ আছে বলে তিনি মনে করেন না।

তবে হোমসের দুটো কথা নিয়ে ফাঁসে উঠলেন প্রফেসর। হোমস লিখেছে, ওদের চোখে নাকি পৃথিবীর মানুষ কীট-পতঙ্গের সামিল। তাদের দলে প্রফেসর পড়তে রাজী নন। দ্বিতীয় কথাটা অবশ্য একটু চিন্তার ব্যাপার। পৃথিবীর জল হাওয়ায় মঙ্গলগ্রহীরা নাকি ফ্যাসাদে পড়তে পারে—স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে।

এ নিয়ে গবেষণার দরকার। কেন?—গজগজ করতে লাগলেন প্রফেসর। তবুও খচখচ করতে লাগল মনের ভেতরটা। হাজার হোক হোমসের কথা তো। বাজে কথা সে বলে না।

হোমস্ আরও লিখেছে, ক্রস্ট্যালটা যেন সযত্নে রাখা হয়। এ ক্রস্ট্যাল দখল করার চেষ্টা করতে পারে ব্যাটাচ্ছেলেরা। ক্রস্ট্যালের কথা খেয়াল হতেই কালো কাপড় মাথায় ঢাকা দিয়ে বসে গেলেন প্রফেসর। দেখলেন চামড়ার থলির মত দেহ নিয়ে মঙ্গলগ্রহীরা নড়াচড়া করছে। আরও দেখলেন,ন্যাংটা শরীরের একটা মানুষকে চিৎপাত করে মাটির ওপর চেপে রয়েছে কতকগুলো ধাতু দিয়ে তৈরী শুঁড়। সেই লোকটা নিশ্চয়—ওকিংয়ে গর্তে নেমেছিল বলে যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মঙ্গলগ্রহীরা। কিন্তু কি করতে চায় ওকে নিয়ে? কাপড়-জামা খুলে শুইয়ে রেখেছে কেন? ছটফট করছে লোকটা। হাঁ করে যেন খাবি খাচ্ছে। বোধ হয় চেঁচাচ্ছেও। মঙ্গলগ্রহীরা ঘিরে ধরেছে ওকে। ধাতুর শুঁড়গুলো চেপে রেখেছে মেঝের ওপর। হঠাৎ আর একটা ধাতুর শুঁড় আবির্ভূত হল দৃষ্টিপথে। একটা চকচকে নল ঢুকিয়ে দিল লোকটার বুকে। তারপর নলের খোলা নলে মুখ লাগিয়ে একে একে সরে যেতে লাগলো ভিনগ্রহী আতংকরা। ঠিক যেভাবে সোডাওয়াটার পান করা হয় কাগজের নল লাগিয়ে—অনেকটা সেই রকমের দৃশ্য দেখেই চ্যালেঞ্জার বুঝলেন কি ভয়ানক উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে আগন্তুকরা। মানুষের কাঁচা রক্ত ওদের উপাদেয় খাদ্য। টাটকা রক্তে সঞ্জীবিত রাখছে নিজেদের—উষ্ণ রুধিরে স্নিগ্ধ করছে তৃষিত দেহের জ্বালা। হোমস্ ঠিক অনুমানই করেছে। পৃথিবীর মানুষ ওদের কাছে পোকামাকড় ছাড়া কিছুই নয়।

ক্রস্ট্যাল নামিয়ে হাঁক পাড়লেন প্রফেসর। গিন্নীকে ডেকে বললেন, আজই লণ্ডন ছেড়ে পালাতে হবে। এ জায়গা আর নিরাপদ নয়।—ক্রস্ট্যাল সে কথা বলছে।

কি বলছে, তা আর ভাঙলেন না।

[১৩]
প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বনাম মঙ্গলগ্রহী

সেই রাতেই চম্পট দেবেন মুখে বললেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন ছেড়ে নড়লেন না প্রফেসর। রোজ নিজে গিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হকারের কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনে পড়তেন, সারে জেলা থেকে মঙ্গলগ্রহীদের মার খেয়ে ভিটে ছাড়া হয়ে পালিয়ে আসা মানুষদের জেরা করতেন, কী কী হাতিয়ার আততায়ীরা ব্যবহার করছে, তার হিসেব নিতেন এবং আগন্তুকদের উদ্দেশ্যটা আঁচ করবার চেষ্টা করতেন। আর রোজ রাতে লক্ষ্য করতেন আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার মত একটি করে চোঙা এসে নামছে পৃথিবীতে। আর প্রতিদিন বার কয়েক টেলিফোন করতেন শার্লক হোমসকে। রিং বেজেই যেত, কেউ ধরত না। রেগে-মেগে দমাম করে রিসিভার ঝুলিয়ে রেখে ফের দাঁড়াতেন রাস্তায়।

এইভাবেই একদিন রাস্তায় শুনলেন ড্রাইভার অস্টিনকে একটা লোক কি যেন বোঝাচ্ছে। অস্টিন রাজী হচ্ছে না।

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন চ্যালেঞ্জার, লোকটার সঙ্গে একটা এক ঘোড়ার চমৎকার গাড়ী। দু'জনের বসার জায়গা আছে।

দেখেই মতলবটা এল মাথায়।

"অস্টিন" হাঁক দিলেন প্রফেসর।

দৌড়ে এল অস্টিন।

"কি বলছে লোকটা?"

"আজ্ঞে, ভল্যান্টিয়ার হতে বলছে।"

"কিসের ভল্যান্টিয়ার?"

"ট্রেন চালাতে হবে। ড্রাইভার পাওয়া যাচ্ছে না।"

"চ্যালেঞ্জার জানতেন গুণধর অস্টিন অনেক কিছুই ড্রাইভ করতে জানে। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন—যাও।"

"যাব ?" অস্টিন যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

"হ্যাঁ, যাও। দেশের কাজ কর। এ বাড়ির কাজের লোকদের দেশে পাঠিয়ে দাও। আর ঐ লোকটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অস্টিন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ডেকে নিয়ে এল গাড়ী আর ঘোড়ার মালিক অচেনা মানুষটিকে।

"আপনার ড্রাইভার অস্টিনকে—"

"আপনাদের দরকার ? নিয়ে যান। বিনিময়ে আপনার ঐ গাড়ী আর ঘোড়াটা রেখে যান।—কত দাম ?"

"অ্যাঁ ?"

"কত দাম ?"

"আজ্ঞে···মানে..."

"এই নিন দশ পাউণ্ড। গাড়ী আর ঘোড়া আমার। আচ্ছা আসুন।"

হতবাক লোকটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেই চ্যালেঞ্জার ছুটলেন বাড়ীর ভেতরে—"জেসি! জেসি!"

"হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন প্রফেসর-জায়া। ছাদ কাঁপানো অমন ডাক শুনলে কেউ স্থির থাকতে পারে ?

"জেসি, জিনিস পত্র গুছিয়ে নাও। গয়না সব নেবে, কিছু খাবার আর জল। জলদি!"

"কোথায় যাবো ?"

"বাঁচতে", বলে আর কথা বাড়ালো না প্রফেসর। ঝট-পট নিজে বাইরের পোশাক পরে নিয়ে পকেটে গুঁজে নিলেন বেশ কিছু নোট আর মোহর। তারপর মালপত্র আর গিন্নীকে আগে তুলে দিলেন গাড়ীতে। নিজে উঠে বসলেন গিন্নীর পাশে। গাড়ী ছোটালেন পরমুহূর্তেই।

দিন কয়েকের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে পাতা ভরাতে আর চাই না। কোথাও পরিত্যক্ত দোকান থেকে খাবার সংগ্রহ করলেন, কোথাও বা তালা দেওয়া দরজা ভেঙে পরের বাড়ীতে রাত কাটালেন, আবার কখনো স্রেফ খড়ের গাদাতেই কর্তাগিন্নী রাত কাটিয়ে দিলেন। এইভাবে পঞ্চাশটা মাইল পেরিয়ে পৌঁছোলেন সমুদ্রতীরে।

গিয়ে দেখলেন, বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে তাঁদের আগেই। খানকয়েক ছোটোবড়ো জলপোতে বিপজ্জনক ভাবে উঠছে যাত্রী। দূরে দাঁড়িয়ে একটা যুদ্ধ জাহাজ, প্রহরারত।

মুস্কিলে পড়লেন চ্যালেঞ্জার। যে রকম গুঁতোগুঁতি চলছে, বউ নিয়ে ওঠা মুস্কিল। পকেটে টাকা আছে, কিন্তু টাকা ছড়িয়েও কাজ তো হবে না।, জায়গা তো নেই।

হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল,—"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার! প্রফেসর চ্যালেঞ্জার!"

ফিরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। খর্বকায় এক ক্যাপ্টেন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে তাঁর পানে। কাছে এসেই বললে সোল্লাসে—"চিনতে পারছেন ? আমি হ্যারিস। ক্যাপ্টেন হ্যারিস!"

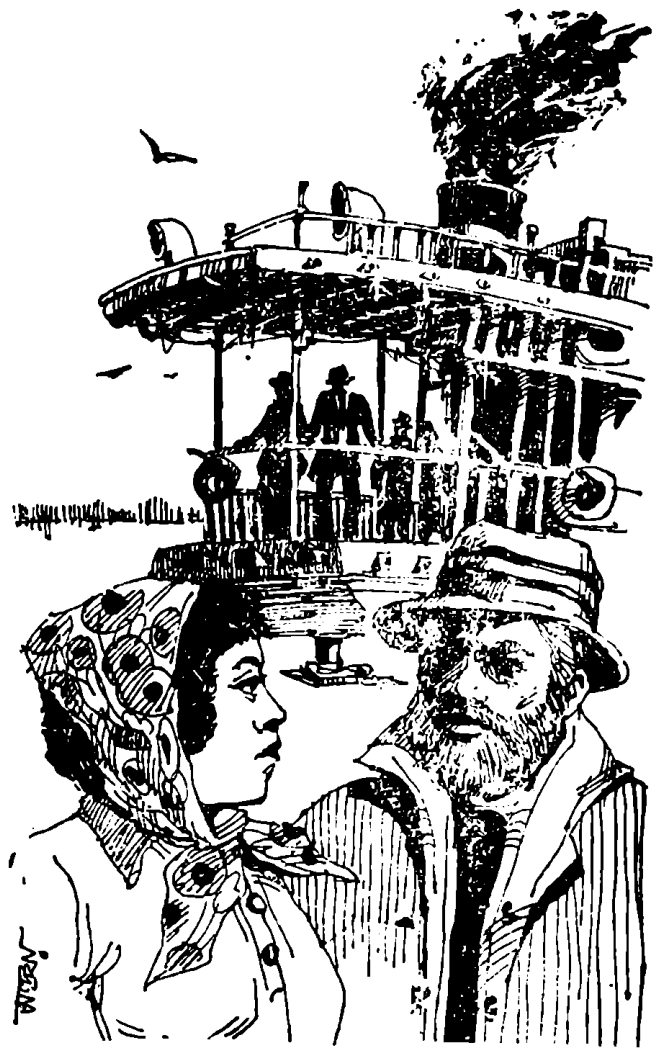

জে সি. জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও

তীক্ষ্ণ চোখে হ্যারিসের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রফেসর বললেন—"বিলক্ষণ চিনেছি। এক বছর তিন মাস দুদিন আগে—"

"আপনি আমার বিরাট একটা উপকার করেছিলেন। সেদিন যদি—"

"থাকে সে কথা। নিজের জাহাজটা কোথায় ?" [ক্রমশঃ]

পড়াশোনা

উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি

নন্দলাল মাইতি

সেদিন হঠাৎ রেনেশাঁ গণিত ক্লাবের ছেলেরা একটি নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেল, আর বিশেষ করে অনুরোধ করে গেল আমি যেন আগামী রবিবার বেলা ৩টার সময় অবশ্যই ওদের ক্লাবে উপস্থিত থাকি। প্রথমটা আমি একদম রাজি হতে চাইনি। কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবার ওদের আগ্রহ দেখে না রাজি হয়ে পারলুম না। যাবার সময় ওরা বার বার করে বলে গেল,—"স্যার, আপনি না গেলে আমাদের ওই দিনের ফাংশান হবে না,—আপনাকে যেতেই হবে।"

ওরা চলে যাবার পর নিমন্ত্রণ লিপি পড়ে দেখি আমাকে সভাপতি করা হয়েছে। নিচে আলোচনার বিষয় ও বক্তার নাম লেখা আছে ঃ

বিষয় ঃ—উৎপাদক নির্ণয়ের সহজতম পদ্ধতি

বক্তা ঃ—শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় [দশম শ্রেণীর ছাত্র]।

সভাপতি হতে আমার একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু আলোচনার বিষয় বীজগণিত হওয়ায় এবং বক্তা একজন স্কুলের ছাত্র হওয়ায় আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। তা ছাড়া স্কুলের বীজগণিত পড়ানোর ব্যাপারটি জানা ছিল, কিন্তু উৎপাদক নির্ণয়ের এমন কিছু সহজ পদ্ধতি বিশেষ জানা ছিল না। তাই আগ্রহ বেশ বেড়ে গেল। ভাবলাম, দেখি শ্রীমান দীপঙ্কর কি বলে।

রেনেশাঁ গণিত ক্লাবের কর্মকর্তা, সভ্য-সভ্যারা ও শ্রোতারা বোধ হয় বাঙালী নয়! নিমন্ত্রণ পত্রে সভা আরম্ভের সময় নির্দিষ্ট ছিল বেলা তিন ঘটিকা। আমি ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে দেখি সব আয়োজন সম্পূর্ণ। কেবল আমার জন্যই যেন সভার কাজ শুরু হতে পারেনি। যথারীতি সভাপতির আসনে বসে শ্রীমান দীপঙ্করকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো তিনটে বাজল ঘড়িতে।

সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত দীপঙ্কর নামে একজন কিশোর মাইক্রোফোনের সামনে এগিয়ে এলো। তার এগিয়ে আসা ও দাঁড়াবার মধ্যে এমন একটি আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছিল, মনে হলো সে যেন সত্যিই নতুন কিছু-একটা বলবে। যথারীতি সভাপতি ও অন্যান্যদের অভিবাদন জানিয়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গলায় সে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলল,—সহপাঠী ও ভাইবোনেরা, আমি প্রকৃত-পক্ষে বক্তৃতা করব না, তোমাদের সঙ্গে আজকের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সত্যি কথা বলতে কি, বক্তৃতা করার মতো জ্ঞান ও বুদ্ধি আমার নেই। নতুন যে বিষয়টি উপস্থাপিত করবো তা আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের ভাব বিনিময় করব আর নিজেদের অসুবিধার কথাগুলি বুঝে নিতে চেষ্টা করবো। মুস্তাক, কি বলো?

মুস্তাক ॥ হ্যাঁ, আমরা এই আলোচনায় সক্রিয় সহযোগিতা করবো।

দীপঙ্কর ॥ আশা করি, ইতিমধ্যে তোমরা সবাই দ্বিঘাত রাশিমালার মধ্যপদ বিশ্লেষণের দ্বারা উৎপাদক নির্ণয়ের একটি নিয়ম জান। সেই ছোট্ট চমৎকার নিয়ম বা সূত্রটি কি তোমাদের মনে আছে,—"আদ্যামাদ্যে নান্ত্যমন্ত্যেন" অর্থাৎ যার মানে প্রথমটি প্রথমের দ্বারা ও শেষেরটি শেষের দ্বারা।

দিব্যেন্দু ॥ তাই না? ওই নিয়মটি আমরা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ্ম সংখ্যায় পড়েছি। এই নিয়মটি অভিনব বলে মনে হয়।

কল্যাণ ॥ আমি এই নিয়মের সাহায্যে অনেক অঙ্ক কষেছি।

দীপঙ্কর ॥ হ্যাঁ, সত্যিই নিয়মটি ম্যাজিকের মতো। কিন্তু ওই নিয়ম দিয়ে কেবল একটি বিশেষ আকারের দ্বৈজিক রাশিমালার উৎপাদক নির্ণয় করা যায়। সেই বিশেষ আকারটি কি তা বোধ করি তোমাদের কারো অজানা নেই।

কাশী ॥ সেই আকারটি হচ্ছে px^2+qx+r। অঙ্কে আকারের গুরুত্ব খুব বেশি, তাই না দীপঙ্কর?

দীপঙ্কর ॥ হ্যাঁ ভাই, অঙ্কে এই আকার চিনতে পারলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়। অথচ আমরা অনেকেই এই আকারের প্রতি বিশেষ নজর দিই না। কেবল যন্ত্রের মতো কিছু অঙ্ক কষে চলি।

দিব্যেন্দু ॥ আচ্ছা দীপঙ্করদা, বীজগণিতে তো অনেক ধরনের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয়। আজ তুমি কোন ধরনের রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করবে?

দীপঙ্কর ॥ ঠিক বলেছ, দিব্যেন্দু। বীজগণিতে অনেক

রকমের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয়। তবে যেগুলো আমরা স্কুলে করি, আর পরীক্ষায় বার বার আসে এমন এক ধরনের উৎপাদক নির্ণয়ের কথাই আলোচনা করবো।

কল্যাণ ॥ আমার মনে হয় তুমি দ্বিঘাত রাশির উৎপাদক নির্ণয় নিয়ে কোন সহজ পদ্ধতির কথা বলবে।

অদিতি ॥ তুমি কি করে বুঝলে?

কল্যাণ ॥ কারণ দীপঙ্কর দ্বিঘাত রাশিমালার মধ্যপদ বিশ্লেষণ করে উৎপাদক নির্ণয়ের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

দীপঙ্কর ॥ তুমি ঠিক ধরেছ, কল্যাণ। আমি দ্বিঘাত রাশিমালার উৎপাদক নির্ণয়ের একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলবো। আমরা স্কুলে এ ধরনের ফ্যাক্টর করি, আর পরীক্ষাতেও আসে। অথচ অনেকে আবার পারি না। আমি বোর্ডে অঙ্কটা লিখছি, লক্ষ্য কর:

$$x^2-y^2-z^2-2yz+x-y-z$$

মুস্তাক ॥ বুঝলে দীপঙ্কর, এ ধরনের অঙ্ক কষতে আমার বেশ অসুবিধা হয়। স্যার যখন কষে দেন, তখন বুঝতে পারি। কিন্তু x, y, z চলগুলি নিয়ে ঠিক মতো সামলাতে পারি না, যেন গোলমাল হয়ে যায়।

দীপঙ্কর ॥ [মৃদু হেসে] বেশ তো, আমি দুটি পদ্ধতিতেই অঙ্কটি কষে দেবো,—একটি গতানুগতিক আমাদের স্কুলের পদ্ধতি, আর অন্যটি সহজ পদ্ধতি,—শঙ্করাচার্যজীর পদ্ধতি। দেখবে, শঙ্করাচার্যজীর পদ্ধতিতে চলগুলি নিয়ে তত ঝামেলা নেই। স্কুলের পদ্ধতিতে অঙ্ক কষতে গেলে আগে চলগুলির মধ্যে "সম্পর্ক"-টি বুঝে নিয়ে দুটি সূত্র প্রয়োগ করতে হয়। একটি বর্গ-সূত্র অর্থাৎ $(a+b)^2$ বা $(a-b)^2$, আর অপর সূত্র দুটি রাশির বর্গের অন্তরের সূত্র অর্থাৎ a^2-b^2। তারপর আবার 'কমন' (common) নেওয়ার ব্যাপার তো সব জায়গাতেই আছে।

দিব্যেন্দু ॥ কিন্তু আমি ওই বর্গ করে নেওয়ার ব্যাপারটায় অসুবিধে বোধ করি।

অদিতি ॥ দিব্যেন্দু বোধ হয় পূর্ণবর্গ করার জন্য যে-সংখ্যাটি ধরে নিতে হয় তার কথা বলছ?

দিব্যেন্দু ॥ অদিতিদি, তুমি আমার অসুবিধের জায়গাটা ঠিক ধরেছ।

দীপঙ্কর ॥ শুধু তুমি একা নও দিব্যেন্দু, এই ধরে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকের অসুবিধে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এখানেই এই পদ্ধতির জটিলতা। যেমন,—$4x^2-4xy-2yz-z^2$ এই রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রচলিত পদ্ধতিতে y^2 ধরে নিতে হয়, আবার বাদ দিতেও হয়। যে-সব রাশিমালায় পদ-সংখ্যা বেশি, সেখানে আরো জটিলতা। এই জটিল ধরনের রাশির সহজ উৎপাদক নির্ণয় কিভাবে করা যাবে, সে-সম্বন্ধে আজ আলোচনা করবো বলে এসেছি। তবে নতুন নিয়মটি বলার আগে প্রচলিত পদ্ধতিতে আমাদের বোর্ডে লেখা রাশিটির উৎপাদক বিশ্লেষণ করা যাক:

$$\begin{aligned}
&x^2-y^2-z^2-2yz+x-y-z\\
&=(x)^2-(y^2+z^2+2yz)+(x-y-x)\\
&=(x)^2-(y+z)^2+(x-y-z)\\
&=(x+y+z)\,(x-y-z)+(x-y-z)\\
&=(x-y-z)\,(x+y+z+1)
\end{aligned}$$

দিব্যেন্দু, এরকমভাবে কি আমরা স্কুলে অঙ্ক শিখি না?

দিব্যেন্দু ॥ হ্যাঁ, ঠিক এরকমভাবেই শিখি। এবার ফাইন্যাল পরীক্ষায় এ ধরনের অঙ্ক আসবে বলে স্যার বলেছেন।

দীপঙ্কর ॥ কেবল অষ্টম-নবম শ্রেণীতেই নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও এ রকমের অঙ্ক আসে।

মুস্তাক ॥ এবার নতুন পদ্ধতিতে কিভাবে অঙ্কটি কষা যায় বলো।

দীপঙ্কর ॥ নতুন পদ্ধতিতে অঙ্কটি কষতে হলে তিনটি অজ্ঞাত রাশি x, y ও z এর মধ্যে দুটির মান শূন্য ধরে নিয়ে px^2+qx+r আকারের দুটি রাশি করে নিতে হয়। তারপর সেই রাশি দুটি "আদ্যমাদ্যেনান্ত্য-মন্ত্যেন" সূত্র প্রয়োগ করে অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে যেটা সুবিধে বোধ করবে, তার সাহায্যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করে নিতে হয়। শেষে এই দুটি রাশির উৎপাদক দেখে প্রদত্ত রাশির উৎপাদক নির্ণয় করা হয়। মোটামুটি এই হলো নতুন পদ্ধতির নিয়ম।

কাশী ॥ এবার তুমি নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও।

দীপঙ্কর ॥ তা হলে বোর্ডের দিকে লক্ষ্য কর,—

$z=0$ হলে,

$$\begin{aligned}
\text{অবশিষ্ট অংশ}&=x^2-y^2+x-y\\
&=(x)^2-(y)^2+(x-y)\\
&=(x+y)(x-y)+(x-y)\\
&=(x-y)(x+y+1)\ldots\ldots(1)
\end{aligned}$$

আবার, $y=0$ হলে,

$$\begin{aligned}
\text{অবশিষ্ট অংশ}&=x^2-z^2+x-z\\
&=(x+z)(x-z)+(x-z)
\end{aligned}$$

$=(x-z)(x+z+1)$.....(2)

অদিতি ॥ এখন (1) ও (2) থেকে কিভাবে মূল রাশি $x^2-y^2-z^2-2yz+x-y-z$-এর উৎপাদক নির্ণয় করা যাবে ?

দীপঙ্কর ॥ আমি এবার সে-কথাই বলছি, অদিতি। এই কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনে বুঝে নেবার চেষ্টা কর। প্রথমে $z=0$ ধরার জন্য মূল রাশিতে আমরা ইচ্ছে করে একটা শূন্যস্থান (gap) রেখেছি,—সেটা z-এর শূন্যস্থান। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $y=0$ ধরায় সেখানে z-এর কোন শূন্যস্থান নাই। সুতরাং (2)নং থেকে z নিয়ে (1)নং-এর শূন্যস্থান বা gap পূরণ করা যেতে পারে। আর তা হলেই মূল রাশির উৎপাদক নির্ণীত হবে। যেমন,—উপরের (1)নং (2)নং মিলিয়ে অর্থাৎ (1)নং এর শূন্যস্থান (2)নং থেকে পূর্ণ করে লেখা যায় $(x-y-z)(x+y+z+1)$।

কল্যাণ ॥ তুমি যে ম্যাজিক দেখিয়ে দিলে, দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর ॥ না ভাই, এটা কিন্তু ম্যাজিক নয়। আসলে, না বুঝলে ম্যাজিক, বুঝলে কিন্তু ম্যাজিক নয়,—স্রেফ অঙ্ক।

মুস্তাক ॥ অঙ্ক কষার নিয়ম বলেছ। কিন্তু কোন সূত্র আছে কি ?

দীপঙ্কর ॥ হ্যাঁ, সূত্র নিশ্চয়ই আছে। আর ভারতী কৃষ্ণ তীর্থজী মহারাজের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি খুব ছোট্ট, মনে রাখা খুব সহজ। সূত্রটি কথায় লেখা,—"লোপন স্থাপনাভ্যাং"। এই সংস্কৃত কথাটির বাংলা ভাষায় মানে হলো "পর পর অপসারণ ও সংরক্ষণ দ্বারা"।

কাশী ॥ সত্যি অঙ্কটি কষার পদ্ধতির সঙ্গে সূত্রটির অর্থের খুব মিল আছে। যেমন, প্রথমে z অপসারণ ; x ও y সংরক্ষণ করা হচ্ছে ; আবার পরের বার y অপসারণ করে x ও z সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

দীপঙ্কর ॥ তুমি খুব সুন্দর করে সূত্রটির ব্যাখ্যা করায় তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। আর অঙ্ক কষা যাবে না।

অদিতি ॥ তুমি কয়েকটি এ ধরনের অঙ্ক বোর্ডে লিখে দাও যাতে আমরা সূত্রটি প্রয়োগ করে অনুশীলন করতে পারি।

দীপঙ্কর ॥ তবে তাই হোক। তোমরা লিখে নাও,—

1. $4x^2-4xy-2yz-z^2$
2. $2x^2+2y^2+5xy+2x-5y-12$
3. $3x^2+y^2-2z^2-4xy+yz-zx$
4. $2x^2+6y^2+3z^2+7xy+11yz+7zx$
5. $3x^2-8xy+4y^2+4y-3$

অঙ্কগুলি লেখা শেষ হলো, আর সময় ফুরালো। সভার সমাপ্তি ঘোষণা করার আগে আমি দীপঙ্করকে ধন্যবাদ জানালাম, আর আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালাম।

বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম আমাদের কিশোর-কিশোরীরা পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে নানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষায় আগ্রহী। এতে আমার মন ভরে উঠল।

ঠাকুরানীচক হাইস্কুল, পোঃ ঠাকুরানীচক, হুগলী

ইউক্রেনিয়ান বিজ্ঞান প্রদর্শনী ● রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২০শে নভেম্বর কলকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের গোর্কি সদনে ইউক্রেনিয়ান সাধারণতন্ত্রে বিজ্ঞানের প্রগতি সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ মনসুর হবিবুল্লাহ।

ইউক্রেনিয়ান সাধারণতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ একটি রিপাবলিক। প্রদর্শনীতে তারই পরিচয় পাওয়া গেল। শিল্পক্ষেত্রে এবং শিক্ষায়তন ও গবেষণা-গারে ব্যবহারোপযোগী নানা-রকমের যন্ত্রপাতি ও তার মডেল প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ছিল সুদৃশ্য, চার্ট ও পোস্টার। নতুন উদ্ভাসিত রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ দ্রব্য, কৃষিকার্যের সার, পরিবেশ সংরক্ষণের পদ্ধতি ইত্যাদিও প্রদর্শিত হয়েছে। নানা দিক থেকে প্রদর্শনীটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ইউক্রেন থেকে একদল বিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি এসেছিলেন। অনুষ্ঠানশেষে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

অজানা মহাকাশে

১৫

[ক্রমশঃ]

স্টিরিওফোনিক শব্দ কাকে বলে ?

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

তোমরা সবাই, নিশ্চয়ই স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার দেখেছ। দুটো লাউডস্পীকার দিয়ে তাতে কেমন সুন্দর আওয়াজ শোনা যায় তাই না ? তোমরা হয়তো আরও লক্ষ্য করেছ যে রেকর্ডও দু'রকমের আছে, এক রকমের 'মনো' এবং আর এক রকমের 'স্টিরিও'। কিন্তু কেন লোকেরা মাথা ঘামিয়ে এসব করেছে, একটা লাউডস্পীকারের জায়গায় দুটো লাগিয়েছে, মনো রেকর্ড আর স্টিরিও রেকর্ডের মধ্যে তফাৎই বা কি তা বোধহয় তোমরা সঠিকভাবে জান না। আজ তোমাদের সেইসব কথাই বলব।

ছাদে উঠলে তোমরা কত দূরের দূরের জিনিস দেখতে পাও, তাই না ? উঁচু উঁচু বাড়ী, গাছপালা আর আরও অনেক দূরের হাওড়ার পুল। সবচেয়ে মজা হোল কোনটা কাছে আর কোনটা দূরে তা তোমাদের বলে দিতে হয় না। শুধু চোখে দেখেই বলে দিতে পার কোন বাড়ীটা কাছে আর কোন বাড়ীটা দূরে। এবার একটা কাজ কর, একটা চোখ বন্ধ করে আবার আগের মত দূরের দিকে তাকাও। দেখবে এক অবাক কাণ্ড। কোনটা কাছে বা কোনটা দূরে তা আর আগের মত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন গাছপালা বাড়ীঘর সব যেন এক বিরাট কাগজে ছবির মত আঁকা রয়েছে। কেন এমন হয় বলতো ? আমরা যখন দুচোখ দিয়ে দেখি, তখন যে জিনিসটা দেখি তা থেকে আলোক রশ্মি দু'ভাগে ভাগ হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছয়। যখন কাছের জিনিস দেখি তখন ঐ দু'ভাগ রশ্মির মধ্যেকার কোণটা হয় বেশ বড়। কিন্তু দূরের জিনিসের বেলায় এই কোণটা হয় বেশ ছোট। এক নম্বর ছবিটা দেখলেই তা তোমরা বুঝতে পারবে। অপর দিকে, আমাদের চোখের দেখা ব্যবস্থাটা এমন ভাবে তৈরি যে সেই আলোক রশ্মি দুটোর মধ্যেকার কোণটা ছোট হলেই বুঝি সে জিনিসটা দূরে আছে আর কোনটা বড় হলেই বুঝি জিনিসটা কাছে আছে। যখন এক চোখ দিয়ে দেখি তখন একটামাত্র আলোক রশ্মি আমাদের চোখে আসে। তাই দু' চোখের মধ্যে কোন কোণও তৈরী হয় না এবং কোনটা কাছে বা কোনটা দূরে সে ধারণাও আমরা করতে পারি না।

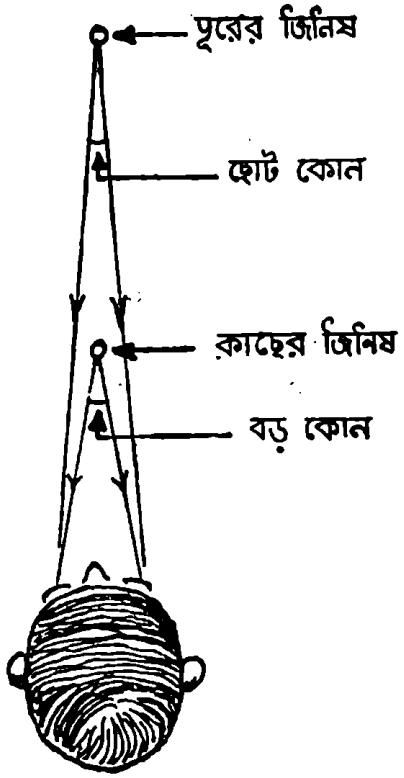

চিত্র নং ১

আমাদের কানে শোনার ব্যাপারটাও ঠিক একই রকম। ধর কোথাও কোন শব্দ হোল, আমরা তখন কিন্তু শুধু কানে শুনেই মোটামুটি বলে দিতে পারি সে শব্দটা আমাদের ডান-দিকে হোল না বাঁ দিকে হোল, কাছে হোল না দূরে হোল। এটা কেমন করে পারি ? এটা পারি আমরা দু' কান দিয়ে শুনি বলে। তোমরা হয়তো জান যে কোন জিনিস কাঁপালেই তা থেকে শব্দের সৃষ্টি হয় এবং তা বাতাসে শব্দের ঢেউ তৈরী করে। জলে ঢিল ফেললে যেমন ঢেউ তৈরী হয় আর তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, শব্দের ঢেউও সেই রকম কাঁপতে থাকা জিনিসটা থেকে তৈরী হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই শব্দের ঢেউ আমাদের কানে পৌঁছে কানের পর্দাকে যখন কাঁপাতে থাকে তখন আমরা শব্দটা শুনতে পাই।

এই শব্দের ঢেউ কিন্তু খুব জোরে চলতে পারে না। আলো যত জোরে চলতে পারে তার থেকে অনেক অনেক ধীরে চলে। তাই দূরে যখন কেউ বাজী ফাটায় তখন তার আলোটা আমরা আগে দেখতে পাই এবং শব্দটা শুনতে পাই অনেক পরে। সেই রকম আমাদের কাছা-কাছি কোন শব্দ হলে তার ঢেউ তাড়াতাড়ি আমাদের কানে পৌঁছে যায় তাই আওয়াজটাও তাড়াতাড়ি শুনতে পাই। শব্দ যত দূরে হয় তার ঢেউও তত দেরী করে আমাদের কানে পৌঁছায় এবং শব্দটাও আমরা তত দেরীতে শুনতে পাই। এবার মনে কর তোমার ডান দিকে কোন শব্দ হোল। তা হলে ঐ শব্দের ঢেউ তোমার ডান কানে

আগে পৌঁছে যাবে এবং বাঁ কানে পৌঁছবে তার একটু পরে। এই যে ডান কান ও বাঁ কানে শব্দ পৌঁছতে একটু সময়ের কম বেশী হোল তা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে শব্দটা ডান দিকে হোল। ঠিক সেই রকম

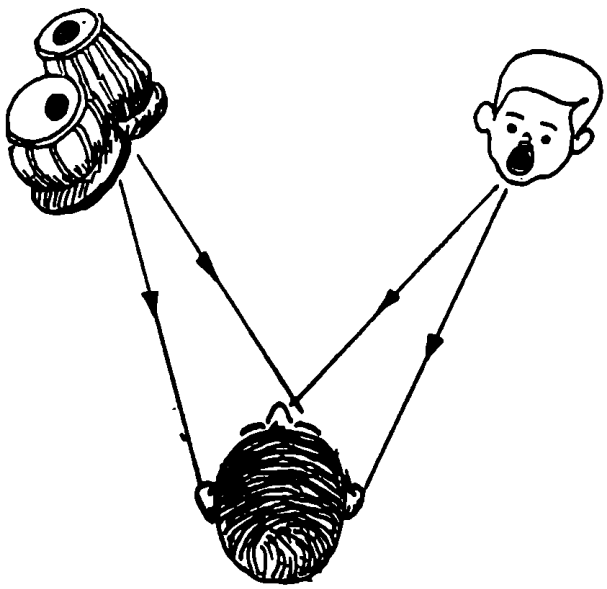

চিত্র নং ২

আমাদের বাঁ দিকে কোন শব্দ হলে তা বাঁ কানে আগে শুনবো এবং ডান কানে পরে শুনবো আর তা থেকেই বুঝতে পারবো সে শব্দটা বাঁ দিকে হোল। এখন মনে কর তুমি কোথাও বসে গান শুনছো। তোমার ডান দিকে গান হচ্ছে আর বাঁ দিকে তবলা বাজছে। তাহলে কিন্তু তুমি চোখ বুঁজে থাকলেও বুঝতে পারবে যে গানটা ডান দিকে হচ্ছে আর তবলাটা বাঁ দিকে বাজছে। কারণ গানের আওয়াজ আগে তোমার ডান কানে, পরে বাঁ কানে যাচ্ছে অথচ তবলার আওয়াজ আগে যাচ্ছে বাঁ কানে, পরে ডান কানে। ২নং ছবিটা দেখলে ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারবে।

এবার স্টিরিও ব্যবস্থার পিছনে কি বিজ্ঞান কাজ করছে তাই আমরা দেখবো। অনেকদিন আগে থাকতেই মানুষ লক্ষ্য করে আসছে যে সত্যি সত্যি যেখানে গান বাজনা হচ্ছে সেখানে বসে তা শুনতে যত ভাল লাগে পরে সেই একই বাজনার রেকর্ড শুনতে অত ভাল লাগে না। কিন্তু কেন এমন হয় সেটা বোঝার আগে মাইক্রোফোন ও লাউডস্পীকারের কাজ কি এবং অ্যাম্প্লিফায়ার কাকে বলে এরকম কিছু কিছু ব্যাপার জেনে নিতে হবে। তোমরা সবাই দেখেছ যে বক্তৃতা বা গান বাজনা করার সময় সামনে একটা মাইক্রোফোন রাখা হয়। শব্দের ঢেউ যখন ঐ মাইক্রোফোনের ওপর গিয়ে পড়ে তখন মাইক্রোফোন সেই শব্দের ঢেউকে বিদ্যুতের ঢেউ'এ পরিণত করে ফেলে। অবশ্য এই বিদ্যুতের ঢেউগুলো থাকে খুবই কমজোরী এবং এই দুর্বল ঢেউকে এবার অ্যাম্প্লিফায়ারে এ নিয়ে যাওয়া হয়। অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজ হোল সেই দুর্বল ঢেউগুলোকে বেশ জোরালো করে তোলা। অ্যাম্প্লিফায়ার-এ চাবি দেওয়া থাকে আর সেই চাবি ঘুরিয়ে আমরা ঢেউগুলোকে ইচ্ছে মত জোরালো করতে পারি। এবার সেই জোরালো বিদ্যুতের ঢেউগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় লাউডস্পীকারে এবং লাউডস্পীকার বিদ্যুতের ঢেউগুলোকে আবার শব্দের ঢেউয়ে রূপান্তরিত করে দেয়। চাবি ঘুরিয়ে অ্যাম্প্লিফায়ারের বিদ্যুতের ঢেউকে যত জোরালো করবো লাউডস্পীকারে শব্দের ঢেউও তত জোরালো হবে। কাজেই এসব যন্ত্র ব্যবহার করে খুব মৃদু শব্দকেও অনেক জোরালো করে আমরা সবাইকে শোনাতে পারি।

এবার মনে কর এক জায়গায় গান হচ্ছে এবং সঙ্গে তবলা তানপুরা, বেহালা ইত্যাদি বাজছে। তাদের সামনে দুটো মাইক্রোফোন রাখা আছে এবং তাদের বিদ্যুৎ তরঙ্গ একটা-মাত্র অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে জোরালো করে লাউডস্পীকারে বাজানো হচ্ছে আর তুমি সেই লাউডস্পীকারের সামনে বসে শুনছো। আরও মনে কর তুমি শুধু লাউডস্পীকারের শব্দই শুনতে পাচ্ছ এবং মাঝে একটা কাচের দরজা থাকায় আসল গান বা বাজনার আওয়াজ কিছুই শুনতে পাচ্ছ না। তাহলে তোমার কি মনে হবে জান? মনে হবে যেন গান, তবলা, তানপুরা সব একই জায়গায় বাজছে। আসলে গানটা যেমন মাঝখানটায় হচ্ছে এবং বাজনাগুলোর কোনটা ডানদিকে কোনটা বাঁ দিকে বাজছে, লাউডস্পীকারের আওয়াজ শুনে তা আর বোঝা যাবে না। অর্থাৎ গান ও বাজনাগুলো যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাউডস্পীকারের আওয়াজ থেকে সেই ছড়ানো ছিটানো ভাবটা আর একদমই পাওয়া যাবে না। অথচ তুমি যদি মাইক্রোফোন লাউডস্পীকার ইত্যাদি ব্যবহার না করে সরাসরি শুনতে তাহলে এই ছড়ানো ছিটানো ভাবটা তোমার কানে লাগতো। কারণ তখন তুমি কানে শুনেই বুঝতে পারতে তানপুরাটা কোথায় বাজছে, তবলাটা ডাইনে বাজছে কি বাঁয়ে বাজছে ইত্যাদি। তিন নম্বর ছবিতে এ ব্যাপারটাকেই বোঝানো হয়েছে।

এখন যদি কেউ ঐ লাউডস্পীকারের শব্দ থেকে একটা গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী করে তবে তাকে বলা হবে

মনোরাল রেকর্ড বা মনো রেকর্ড। তোমরা যদি সেই রেকর্ড বাড়ীতে বাজাও তাহলেও মনে হবে যেন সব এক

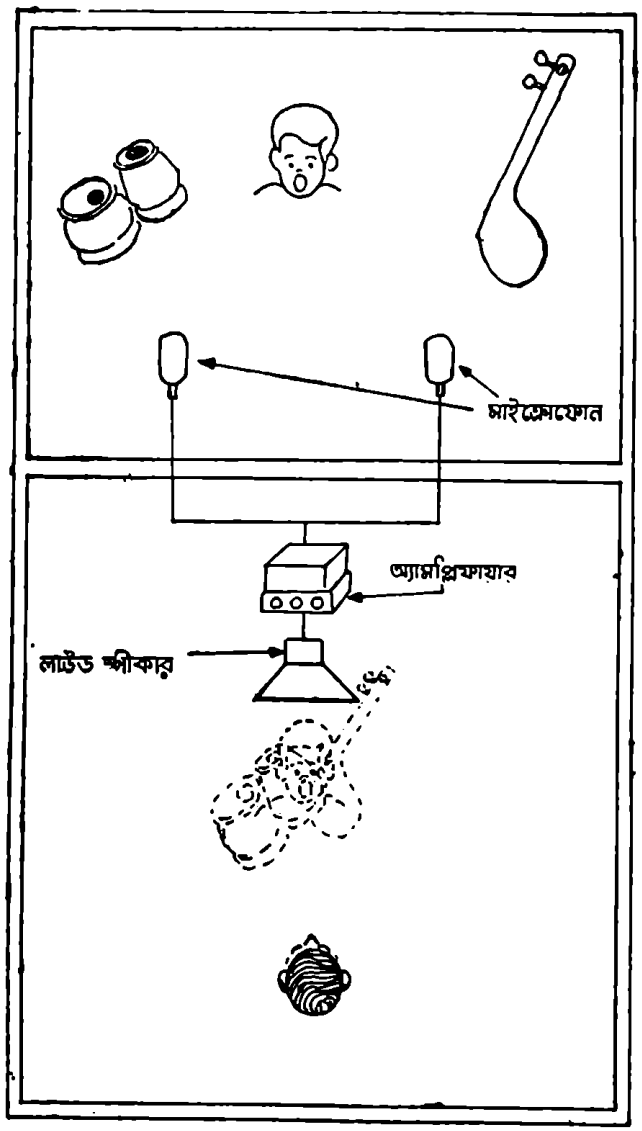

চিত্র—৩

জায়গাতেই বাজছে। গান ও বাজনাগুলোর ছড়ানো ছিটানো ভাবটা রেকর্ডের আওয়াজের মধ্যেও পাওয়া যাবে না।

কেন এরকম হয় বলতো? এ রকম মনে হওয়ার কারণ হোল যখন আমরা দুটো কি তারও বেশী মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ একসঙ্গে করে একটা মাত্র অ্যাম্প্লিফায়ার-এ পাঠাই তখন সব শব্দ মিলে মিশে একটা খিচুড়ি পাকিয়ে যায়। কাজেই লাউডস্পীকারে সেই জড়িয়ে যাওয়া শব্দটা শুনি বলে ছড়ানো ছিটানো ভাবটা আর পাই না।

এবার মনে কর দুটো মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎ তরঙ্গকে একটা অ্যাম্প্লিফায়ার-এ নিয়ে গিয়ে জড়াখিচুড়ি না পাকিয়ে চার নম্বর ছবির মত দুটো অ্যাম্প্লিফায়ার-এ নিয়ে যাওয়া হোল এবং সেই অ্যাম্প্লিফায়ার দুটোর বিদ্যুৎ তরঙ্গ আলাদাভাবে দুটো লাউডস্পীকারে বাজানো হোল। তা ছাড়া, মাইক্রোফোন দুটো যেমন তফাৎ-এ আছে লাউডস্পীকার দুটোকেও ঠিক ততটা তফাতে রাখা হোল। এবার মনে কর তুমি লাউডস্পীকার দুটোর সামনে বসে শুনছ এবং আগের মতই আসল গান বাজনার আওয়াজ কিছুই তোমার কানে আসছে না। দেখবে এক তাজ্জব ব্যাপার! তোমার

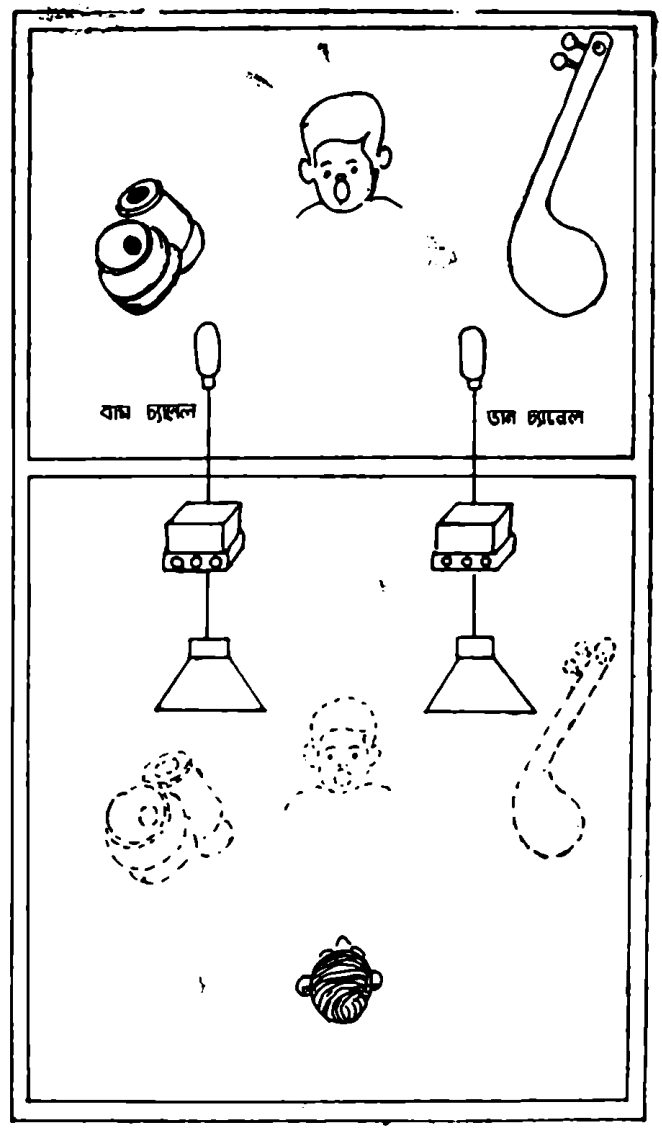

চিত্র—৪

মনে হবে তানপুরার আওয়াজটা ডান দিক থেকে আসছে, তবলার আওয়াজটা বাঁ দিক থেকে আসছে আর গানটা যেন মাঝখানটাতে হচ্ছে। অর্থাৎ বাজনাগুলো যেটা যেখানে বাজছে তোমারও মনে হবে যেন সেটা সেখানেই বাজছে। আসল গান বাজনার সামনে বসে শুনলে যেমন মনে হোত, ঐ লাউডস্পীকার দুটোর সামনে বসে শুনলেও অনেকটা সেই রকম মনে হবে। অর্থাৎ বাজনাগুলো যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, লাউডস্পীকার দুটোর আওয়াজের মধ্যেও সেই ছড়ানো ছিটানো ভাবটা বজায় থাকবে. আর এটাই হোল স্টিরিওফোনিক শব্দ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে স্টিরিওফোনিক সাউণ্ড বা স্টিরিও আওয়াজ পেতে গেলে সমস্ত শব্দ তরঙ্গকে দু'ভাগে ভাগ করে সেই দুটো ভাগকে আলাদা আলাদা অ্যাম্প্লিফায়ার ও লাউডস্পীকার দিয়ে বাজাতে হবে। এই দুটো ভাগকে বলা হয় 'চ্যানেল'। ডান দিকেরটাকে বলে ডান চ্যানেল আর বাঁ দিকেরটাকে বলে বাম চ্যানেল। এবার এই স্টিরিও শব্দ কিভাবে গ্রামোফোনের রেকর্ডে রেকর্ড করা হয় সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে গ্রামোফোনের রেকর্ডে খুব সূক্ষ্ম দাগ কাটা রয়েছে। এই দাগগুলোকে বলে 'গ্রুভ'। গ্রুভ কিন্তু একটাই আর সেটা বাইরের দিক থেকে শুরু করে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে ভিতরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই গ্রুভের মধ্যে শব্দের কাঁপুনিগুলো ধরা থাকে। যখন মনো করা হয় তখন একটা গ্রুভের মধ্যে একটাই শব্দ তরঙ্গ ধরা থাকে। কিন্তু স্টিরিও রেকর্ড করার সময় গ্রুভের এক পাশে ডান চ্যানেলের এবং অপর পাশে বাম চ্যানেলের শব্দ ধরে রাখা হয়। যখন সেই রেকর্ডটা আমরা বাজাই তখন গ্রামোফোনের 'পিন'টা রেকর্ডে ঘষা খেয়ে এমন ভাবে কাঁপতে থাকে যে দুটো চ্যানেলের শব্দ দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দুটো আলাদা বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরী করে। তখন এই দুটো বিদ্যুৎ তরঙ্গকে দুটো আলাদা অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে জোরালো করে দুটো লাউডস্পীকারে বাজালেই স্টিরিও শব্দ তৈরী হয়ে যায়। সেই দুটো

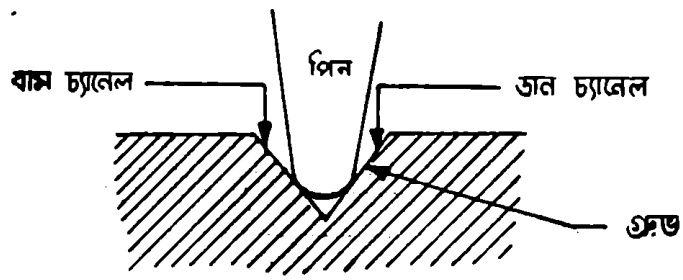

চিত্র নং ৫

লাউডস্পীকারের সামনে বসে আমরা যদি তখন গান বাজনা শুনি তাহলে মনে হবে রেকর্ড করার সময় যে যেখানে বসে গান বাজনা করছিল আমরা যেন তাদের সামনেই বসে আছি।

বোস ইন্সটিটিউট, ৯২, এ. পি. সি. রোড, কলি-৯

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

নবনালন্দায় বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ছে

কিন্নর রায়

দক্ষিণ কলকাতার নবনালন্দা স্কুলে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে উঠেছে অন্যান্য বিভাগের পাশাপাশি। ওই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী ভারতী মিত্র জানালেন, বিজ্ঞান যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের চেতনে অবচেতনে মিশে থাকে, তার জন্যে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে সহ-প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী রত্না ভট্টাচার্যও একমত। শ্রীমতী রত্না ভট্টাচার্য শারদীয়া কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়েছেন। ও'র খুব ভাল লেগেছে।

শ্রীমতী মিত্র জানালেন, ৭৪-৭৫ সাল থেকেই ছেলে-মেয়েরা লাইফ সায়েন্স পড়ছে। তার ওপর মডেল গড়ছে। সমস্ত স্কুলই এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে।

তিনি জানালেন, প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলে বিজ্ঞানের ওপর ফিল্ম দেখানো হয়। শংকর চক্রবর্তী আসেন। এ পর্যন্ত চাঁদ, প্রাণি-জগতের বিবর্তন, পরিবেশ দূষণের ওপর তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, নবনালন্দা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এ বছর, দোসরা আগস্ট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিনে বিজ্ঞান পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন।

শ্রীমতী মিত্র বিজ্ঞান পদযাত্রা সম্বন্ধে বললেন, এই পদ-যাত্রায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমরা চাই পরিবেশ ভালো হোক। বিজ্ঞান চর্চা বাড়ুক। মানুষ এ ব্যাপারে আরও বেশী বেশী আগ্রহী হোক।

ও'র মুখ থেকে জানা গেল, এ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানের নানা মডেল তৈরী করেছে। তার মধ্যে রয়েছে ব্যাটারিতে চলা পাখা, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, পেরিস্কোপ প্রভৃতি। এর ওপর কিছু কিছু নম্বর দেয়ারও ব্যবস্থা আছে।

শ্রীমতী মিত্র জানালেন, আইনস্টাইন শতবার্ষিকীতে আইনস্টাইনের জীবনীর ওপর ছেলেমেয়েদের দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালে এ বি সি ডি—এভাবে পর পর অক্ষর দিয়ে বিজ্ঞানীদের নাম লেখার পরিকল্পনা —কে কটা নাম লিখতে পারে—করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরা মিলে একটি

বিজ্ঞান সেমিনারে অংশগ্রহণকারী নবনালন্দার ছাত্রছাত্রীরা

বিজ্ঞান সেমিনার করেছিলেন। ডঃ সুপ্রিয় রায় এসেছিলেন সেই সেমিনারে। এছাড়া লাইফ সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্স-এর ওপর ম্যাগাজিন বের করেছে ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেনের ছেলেমেয়েরা।

শ্রীমতী মিত্র কয়েকটি মডেল এবং চার্ট দেখালেন। সম্প্রতি তৈরী বেশ ছোট একটি মানুষের কংকাল চোখে পড়লো। ও'র মুখ থেকে শুনলুম এটি এই স্কুলের ছাত্র তৈরী করেছেন।

বিজ্ঞান চর্চা নবনালন্দা স্কুলে ক্রমশই বাড়ছে। এর লাইব্রেরীতেও বিজ্ঞানের যথেষ্ট বই আছে। বিজ্ঞানের বই আরও বাড়বে।

শ্রীমতী ভারতী মিত্র আরও জানালেন, এই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদের সম্পূর্ণরূপে হাজির করেছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আছেন এর পেছনে। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই নবনালন্দা স্কুলে বিজ্ঞান চর্চা সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অগ্রপথিক

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক গ্রন্থ

পশু—পাখী—কীট-পতঙ্গ

প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

[ক্রমশঃ]

পড়াশোনা

আলোকেরই ঝরণা ধারায়

ডঃ অলক চক্রবর্তী

ভোর হল। অন্ধকার দূরে চলে গেল। আলোয় ভরে উঠল চারদিক। কি এল সূর্য থেকে?

সূর্যের কথা বাদ দেওয়া যাক।

দরজা জানালা সব বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আলো জ্বাললেও আমরা দেখতে পাই ঘরের মধ্যে রাখা জিনিস-পত্র। আলো তাহলে কি? আলো একরকম শক্তি যেটা আমাদের চোখে আপতিত হয়ে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

আমরা দেখি চোখের সাহায্যে, দেখায় আমাদের আলো। অর্থাৎ চোখ বন্ধ থাকলে আমরা দেখবো না। কিন্তু অন্ধকার ঘরে চোখ খোলা রাখা সত্ত্বেও আমরা কিছুই দেখতে পারছি না। কারণ ঐ যে, 'দেখায় আমাদের আলো।'

অন্ধকার ঘরে আলো নেই, দেখাবে কে?

কখন বলবো, 'আমি দেখলাম?

কোন বস্তু থেকে আলো চোখে এসে পড়লে যে বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি হয় সেটাই দেখা।

আলো পাই কোথা থেকে? অর্থাৎ আলোকের উৎস কি বা কি কি?

সূর্য এবং আকাশের অসংখ্য তারাই আলোকের প্রধান উৎস। সাধারণভাবে গরম বা উত্তপ্ত বস্তু থেকেই আলো বেরোয়। ইলেকট্রিক বাতি জ্বাললে একটু পরেই কাঁচটা অত্যন্ত গরম হয়ে যায়। তবে সবসময়েই যে উত্তপ্ত বস্তুর গা থেকেই আলো বেরোয় তা নয়। এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কিছু কিছু ঠাণ্ডা বস্তু থেকেও আলোক পাওয়া যায়। জোনাকী পোকা, ঈল (eel) নামে সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদির দেহ থেকেও আলোক বেরোয়। এই আলো ঠাণ্ডা। দু' একরকম গাছের পাতা থেকেও আলোক বেরিয়ে থাকে। বেরিয়াম সালফাইড, ফসফরাস ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ থেকেও আলোক বেরিয়ে থাকে।

আলোক বিজ্ঞান বা আলোক-তত্ত্বে আলোকের ধর্ম এবং স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এই বিজ্ঞানকে আমরা সাধারণত দু'ভাবে ভাগ করি। প্রথম ভাগটির নাম জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান আর দ্বিতীয়টি হলো ভৌত আলোকবিজ্ঞান। আলোকের সঠিক প্রকৃতি না জেনেও আলোকের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি (অর্থাৎ আলোকের বিভিন্ন ধর্ম) যে *বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, তাকে জ্যামিতিক আলোক-বিজ্ঞান* বলে।

যে বিজ্ঞান আলোকের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে তাকে ভৌত আলোক-বিজ্ঞান বলা হয়।

যে সব বস্তুর মধ্যে আলো সহজেই যেতে পারে, তাকে স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। বায়ু, পাতলা কাচ, পরিষ্কার অগভীর জল ইত্যাদি হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যম। স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শোষিত না হয়ে বা অল্প শোষিত হয়ে আলোক যায়।

বিভিন্ন স্বচ্ছ মাধ্যমের জন্য তফাৎটা কোথায় হবে? অর্থাৎ, স্বচ্ছ মাধ্যমটি কাচ না হয়ে জল, জল না হয়ে বায়ু, ইত্যাদি হলে কোন্ জিনিসটা বদলাবে?

মাধ্যমের পরিবর্তনের সঙ্গে আলোকের বেগ এবং দিক উভয়েই বদলে যাবে।

বেশীর ভাগ বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো যায় না, যেমন কাঠ, ইট, পাথর, লোহা ইত্যাদি তাদের অস্বচ্ছ বলা হয়।

কিছু কিছু বস্তু আছে যাদের মধ্য দিয়ে আলোক সহজে যেতে পারে না—অল্প পরিমাণ আলোক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাদের ঈষদচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন কাচ, তেলা কাগজ ইত্যাদি।

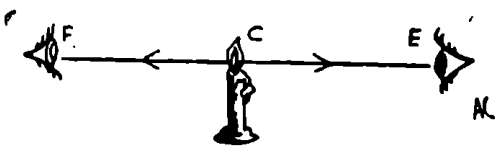

চিত্র নং—১

ঈষদচ্ছ মাধ্যমে আলোকরশ্মি কিছু পরিমাণ সঞ্চালিত হয়। বেশীর ভাগটাই মাধ্যম শোষণ করে নেয়।

একটা সামান্য পরীক্ষা একটু করে দেখবে? পাতলা এক ধরনের কাচের মত কাগজ পাওয়া যায়, সেলোফেন কাগজ বলে। বই-এর মলাটের ওপর এই ধরনের কাগজ তোমরা দেখে থাকবে। একটা সেলোফেন

কাগজ নিয়ে চোখের সামনে ধর। এর মধ্যে দিয়ে সব কিছুই দেখতে পাবে। এবার একে ক্রমশঃ দু'ভাজ, চার ভাজ ইত্যাদি করতে থাকো। একটু পরেই দেখবে তার মধ্যে দিয়ে আর দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা কি হলো? স্বচ্ছ বস্তু একটা নির্দিষ্ট বেধ পর্যন্ত স্বচ্ছ থাকে তারপর ধীরে ধীরে ঈষদচ্ছ এবং একদম শেষে অস্বচ্ছ হয়ে যায়।

উল্টোটাও হয়।

সোনা এমনিতে অস্বচ্ছ, কিন্তু অত্যন্ত পাতলা সোনার পাতের মধ্য দিয়ে আলোক যেতে পারে।

পরিষ্কার জল স্বচ্ছ, সেজন্য বালতিতে জল থাকলেও আমরা এর তলদেশ দেখতে পাই, কিন্তু গভীর পুকুরের তলদেশ দেখতে পাই না জল পরিষ্কার হলেও।

মাধ্যমের এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যেতে আলোক যে পথ গ্রহণ করে, সেই পথকে আলোক রশ্মি বলে। এই পথ সরলরৈখিক পথ হয়। ঐ সরলরৈখিক পথে আমরা একটা তীর চিহ্ন দিয়ে আলোকের গতিপথ বোঝাবো। ১নং ছবিতে E বিন্দুতে রাখা চোখের জন্য আলোক রশ্মি হচ্ছে C থেকে E সরলরেখা। কিন্তু F বিন্দুতে রাখা চোখের জন্য এইপথ C থেকে F; সেইভাবেই তীরচিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

একটা আলোক কিরণ ব্যাপারটা বড় গণ্ডগোলের। মোটা পেন্সিল দিয়ে তুমি একটা আলোক কিরণ আঁকলে। আর কেউ ধরো সরু পেন্সিল দিয়ে আঁকলো (২নং ছবি)। যে সরু রেখা এঁকেছে তার হিসেবে মোটা রেখার মধ্যে দু'চারটি আলোক রশ্মি আছে। ঝগড়াটা

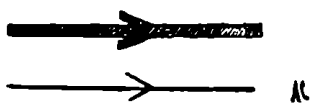

চিত্র নং—২

এড়িয়ে যাওয়া ভাল। আমরা কাছাকাছি অনেকগুলি আলোক রশ্মিকে আলোক কিরণ বা আলোক পেন্সিল বলবো। আর যখন সরলরেখা এঁকে আলোক রশ্মি বোঝাবো, তখন সরু মোটার তর্কবিতর্ক বাদ দেবো, ঐ সরলরেখা একটা আলোক রশ্মি নির্দেশ করলে ব্যাপারটা এই বুঝতে হবে।

আলোক রশ্মি হচ্ছে একটা, কিন্তু আলোক কিরণ হচ্ছে সমষ্টি। এই কিরণ সমান্তরাল [৩নং (ক) ছবি] হতে পারে, অভিসারী হতে পারে, (একটা বিন্দু থেকে ছড়িয়ে

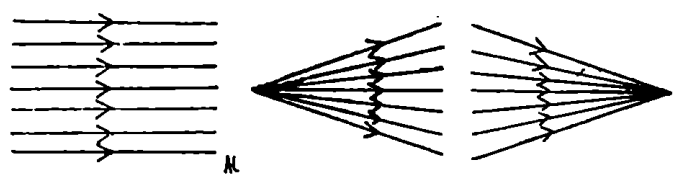

চিত্র নং—৩ চিত্র নং—৩ চিত্র নং—৩

পড়া) কিম্বা অপসারী (একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলছে) হতেও পারে [৩নং (খ), (গ) ছবি]

এবার আসা যাক একটা অন্য প্রসঙ্গে। সরলরেখা টেনে আলোকরশ্মি বোঝানো হচ্ছে কেন? আঁকা বাঁকা রেখা চলবে না কেন? কারণ স্বচ্ছ এবং সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোক সমরেখায় যায়। সমসত্ত্ব অর্থ হচ্ছে মাধ্যমের সর্বত্র একই ভৌত গুণাবলী আছে। একটা সহজ পরীক্ষার সাহায্যে এটা করে দেখতে পারো। তিনটে পোস্টকার্ড নিয়ে প্রত্যেকটির নীচের দিকে কাঠের টুকরো বা মোটা কাগজ এমনভাবে এঁটে দাও যাতে এগুলি

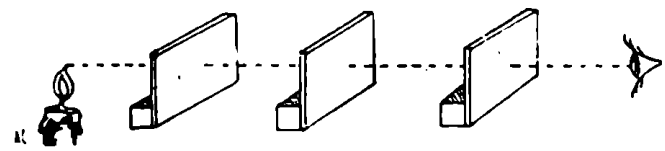

চিত্র নং—৪

খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে (৪নং চিত্র)। প্রত্যেকটি পোস্টকার্ড খাড়া করে রেখে একই উচ্চতায় একটি করে ফুটো করা হলো। খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটি ফুটো যেন একই উচ্চতায় এবং একই সরলরেখায় থাকে। প্রথমে কার্ডের পিছন দিকে একটি মোমবাতি রাখা হলো। তিন নম্বর কার্ডের অপর পাশে চোখ রাখলে বাতির শিখা দেখা যাবে। এখন যদি যে কোন কাউকে এদিক ওদিক সরানো হয় তাহলে আর বাতির শিখা দেখা যাবে না। আঁকা বাঁকা পথে আলোক গেলে কার্ডবোর্ড সরালেও বাতি দেখা যেতো। তাই না?

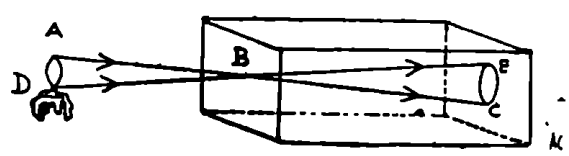

চিত্র নং—৫

এবার একটা অন্য পরীক্ষা করা যাক। এর জন্যে একটা আয়তাকার বাক্স চাই যার ভিতরের অংশ কালো রং করা থাকবে। বাক্সের যে কোন দিকের একটি তলের

মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট ফুটো করতে হবে। (৫নং ছবি) এই তলের ঠিক বিপরীত তলে ঘষা কাচ রাখতে হবে। এখন ফুটোর সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি রাখলে ঘষা কাচে শিখার একটা উল্টো ছবি পাওয়া যাবে। যেটা কাচের উপর পাওয়া গেল, সেটাকে প্রতিকৃতি বলবো। উল্টো প্রতিকৃতি পাওয়ার কারণ আলোকের সরল রেখায় চলা। AB আলোক রশ্মি (৫নং চিত্র) সোজা BC বরাবর যাবে আর DB আলোক রশ্মি BE পথে যাবে। এর ফলেই উল্টো প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। যদি আলোক রশ্মি AB থেকে বেঁকে BE পথে এবং DB থেকে বেঁকে BC পথে যেতো তাহলে উল্টো প্রতিকৃতি পাওয়া যেতো না।

এবার ভাবা যাক, B-তে যে ফুটোটা আছে, সেটাকে বড় করলে কি হবে?

ফুটোটা আকারে বড় হলে প্রতিকৃতি স্পষ্ট দেখা যাবে না। বেশী বড় হলে প্রতিকৃতি দেখাই যাবে না। কারণ বড় ফুটোকে আমরা অনেকগুলি ছোট ছোট ফুটোর সমষ্টি বলে মনে করতে পারি। প্রতি ফুটোর জন্য সৃষ্ট প্রতিকৃতিগুলি একে অন্যের উপর এলোমেলো ভাবে পড়বে, তার ফলে মূল প্রতিকৃতির সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি পাওয়া যাবে না।

আর একটা কথা। বস্তুকে আগুপিছু করলে বা বাক্সের দৈর্ঘ্য কম বেশী করলে প্রতিকৃতির অবস্থা কি রকম হবে? নীচের ছবি (৬নং) দেখো। এই ছবিতে মোমবাতি স্থির রাখা হয়েছে। O হচ্ছে ফুটোটা। চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে ঘষা কাচ যত দূরে নিয়ে যাওয়া হয়ব প্রতিকৃতি তত বড় হবে।

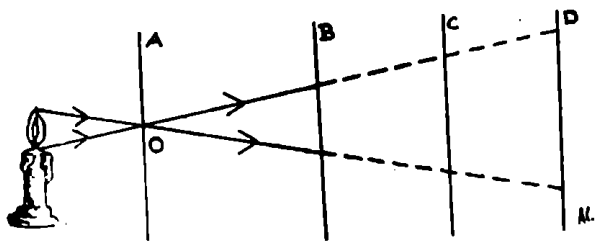

চিত্র নং—৬

তুমি এবার উল্টো ছবিটা আঁকো। মোমবাতি দূরে সরিয়ে নিলে প্রতিকৃতির কি অবস্থা হবে?

এবার একটা মজার প্রশ্ন আলোচনা করা যাক। সূর্যরশ্মি সোজা কোন জানলার একটি ত্রিভুজাকৃতি গর্তের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে বিপরীত দেওয়ালে পড়ল। দেখা যাবে যে, বিপরীত দেওয়ালে যে প্রতিকৃতি পড়েছে, তা ত্রিভুজাকৃতি নয়, গোলাকার।

এর কারণ ফুটোটা ত্রিভুজাকৃতি হলেও এর মাপ খুবই ছোট। ফুটো ছোট হলে প্রতিকৃতি বস্তুর রূপ পায়। ফুটোর আকৃতির উপর নির্ভর করে না। ৭নং ছবি দেখ। গাছের ফাঁক দিয়ে উপর থেকে খাড়াভাবে আলো পড়ছে মাটিতে। কতকগুলি একেবারে গোলাকার সেগুলি সূর্যের প্রতিকৃতি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট ফুটো

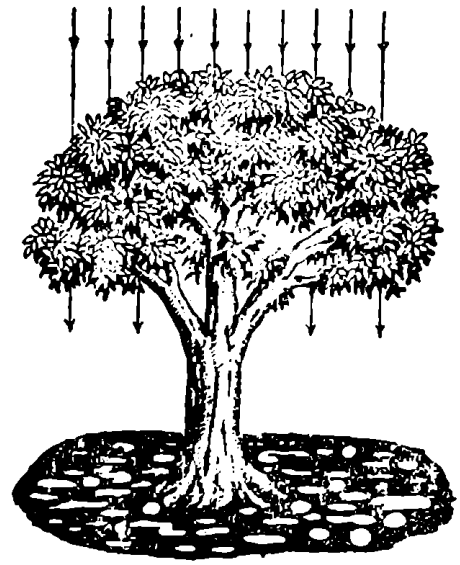

চিত্র নং—৭

তৈরী হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আলো এসে প্রতিকৃতি গঠন করেছে। যদি পাতার মধ্যবর্তী ফাঁক বড় হয় তাহলে সেগুলিকে অনেকগুলি ফুটোর সমষ্টি কল্পনা করবো। এক একটি ফুটো এক একটি প্রতিকৃতি সৃষ্টির কারণ হবে এবং এই প্রতিকৃতিগুলি একে অন্যের উপরে এলোমেলোভাবে পড়ে সুনির্দিষ্ট কোন প্রতিকৃতি দেবে না। একটা মজার প্রশ্ন করে আলোচনা শেষ করি। কোন ব্যক্তির একটি জেব্রার ছবি তোলার প্রয়োজন। কিন্তু কোথাও তিনি জেব্রা না পেয়ে কি করলেন জানো? একটু বড়সড় সাদা গাধা যোগাড় করে ক্যামেরার লেন্সে কালো ডোরা কাটা কাগজ লাগিয়ে গাধার ছবি তুললেন। তিনি কি জেব্রার ছবি পাবেন? একটু ভাববে?

৬সি নলিন সরকার স্ট্রীট, কলি-৪

মাকড়সার জগৎ

অশোক কান্তি সান্যাল

মাকড়সাকে আমরা সবাই চিনি। ঘরে-বাইরে, বাগানে-জঙ্গলে, পথে ঘাটে সব জায়গায় এদের দেখা যায়। আর এদের সাথে দেখা হলেই অনেকে ভয়ে আঁতকে ওঠে, তাই না? অনেকের ধারণা মাকড়সা নাকি বিষাক্ত। কামড়ালে আর রক্ষা নেই। এই ধারণা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। মাকড়সার শরীরে যদিও বিষের থলি ও হুল আছে এবং কয়েক ধরনের মাকড়সা কামড়ালে জ্বালা-যন্ত্রণা করে তবুও মাকড়সা কিন্তু আমাদের পরম বন্ধু। এবার তাহলে প্রশ্ন— কেন বন্ধু? আমাদের চারপাশে যত পোকা বাস করে তাদের অনেকেই ক্ষতিকারক। কেউ ফসল খায়, কেউ চাল-ডাল-আটা খায়, কেউ বা জামা-কাপড়-কাঠ-বই কেটে নষ্ট করে, আবার অনেক পোকা কঠিন কঠিন রোগের জীবাণু বহন করে। এই যে সব পাজী পোকা, এরাই হলো মাকড়সার উপাদেয় খাবার। সুতরাং মাকড়সা এদেরকে ধরে খেয়ে আমাদের পরম বন্ধুর কাজই করে।

মাকড়সার জন্ম আজ থেকে অনেক, অনেক দিন আগে। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা যখন জল ছেড়ে ডাঙ্গায় আসতে পারে নি। মাড়সা তখন ডাঙ্গায় বাস শুরু করেছে। যে সমস্ত বিজ্ঞানী জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের মতে, আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগে মাকড়সার জন্ম। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আশী হাজারেরও বেশী প্রজাতির মাকড়সার খোঁজ পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে প্রায় চারশো প্রজাতি পাওয়া যায় ভারতে।

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে এ্যারাকনী নামে একজন মহিলা ভীষণ ভাল তাঁত বুনতেন। নিজের এই গুণের ব্যাপারে তিনি এত গর্বিত ছিলেন যে, একবার দেবী এ্যাথেনকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানালেন। এ্যাথেন হলেন সমস্ত রকম বয়ন শিল্পের দেবী। ফলে তাঁর কাজ হলো এক অতি আশ্চর্য বস্তু। এ্যারাকনীও দমবার পাত্রী নন। তিনি তাঁর সমস্ত মেধা ধৈর্য ও শিল্প নৈপুণ্যকে কাজে লাগিয়ে যে জিনিস বুনলেন তা দেখে তো সবাই অবাক! কোথায় লাগে এ্যাথেনের কাজ। এ্যাথেন ভীষণ রেগে গিয়ে এ্যারাকনীর জালটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। এ্যারাকনী তখন ক্ষোভে দুঃখে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে প্রাণত্যাগ করলেন। এ্যাথেন এবার দৈবশক্তি প্রভাবে ঝুলন্ত এ্যারাকনীকে মাকড়সায় রূপান্তরিত করে বললেন, এখন থেকে তোমার কাজ হবে যুগ যুগ ধরে জাল বুনে যাওয়া। এই গল্পের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা মাকড়সাকে এ্যারাকনীর বংশধর বলে মনে করেন এবং সেই মত মাকড়সা যে শ্রেণীভুক্ত তার নাম হয়েছে 'এ্যারাকনিডী'।

মাকড়সা সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী হলেও পোকা নয় কিন্তু। কারণ মাকড়সার থাকে চারজোড়া পা আর পোকায় আছে তিন জোড়া। এছাড়া আরো অনেক তফাৎ তো আছেই। এদের রাজ্যে কত যে বিচিত্র রং ও নকশার বাহার তার ইয়ত্তা নেই। চারজোড়া পায়ের প্রত্যেকটিই বেশ লম্বা ও পায়ের মাথায় থাকে দুটো কিংবা তিনটে চিরুনির মত দাঁতালো নখ। এগুলো খাবার ধরা ও সেটাকে খেতে শুরু করার আগেই সেটাকে সাফাই করার কাজে লাগে। পোকার যেমন শুঁড় থাকে মাকড়সারও তেমনি মুখের পাশে থাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল 'পাম্প' ও 'পেডিপাম্প' নামে দুটো উপাঙ্গ। সাধারণতঃ আটটা চোখ মাথার চারপাশে বৃত্তাকারে সাজানো থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছ'টা বা চারটে চোখও থাকতে পারে। এই চোখগুলো বেশ শক্তিশালী। কারণ অন্ধকারে বা আলোতে সব সময়ই মাকড়সা কাছের জিনিস দেখতে পায়। মাকড়সার কোন কান নেই কিন্তু এদের শ্রবণশক্তি ভীষণ প্রখর। লোকে বলে ঘরের মধ্যে গান বাজনা হলে ছাদের কোণে একটা জাল বিছিয়ে যে ছোট্ট মাকড়সাটা চুপটি করে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে নাকি মন দিয়ে গান শোনে আর হেলে দুলে গানের তারিফ করে। এ কথা সত্যি কিনা জানি না তবে এদের দেহের লোমগুলো এতো বেশী অনুভূতি-শীল যে, এরা যে কোন ধরনের শব্দতরঙ্গ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। আর গন্ধ শোঁকা? এ ব্যাপারেও এরা ওস্তাদ। গন্ধ শুঁকেই তো এদের পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে চেনে। আর ভালমন্দ খাবারের বাছবিচারও করে গন্ধের তারতম্য বিশ্লেষণ করে।

মাকড়সার বৈচিত্র্যময় জীবনে এক অত্যাশ্চর্য বিষয় সিল্ক তৈরী ও জাল বোনা। অবশ্য সব মাকড়সা জাল বুনতে পারে না এবং একাজে ওস্তাদ হলো মেয়েরা। দেহের পিছনে এই সিল্ক তৈরীর কারখানা বা সিল্ক গ্রন্থিগুলো সংখ্যায় চারটি বা ছ'টি এবং প্রত্যেক গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে সরু মুখওয়ালা ছোট্ট একটা যন্ত্র যার নাম 'স্পিনারেট'। প্রতিটি স্পিনারেটে থাকে কয়েক'শ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নল। সিল্কগ্রন্থি থেকে তরল সিল্ক এই সূক্ষ্ম নলের মাধ্যমে বেরিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে

যায় এবং সূক্ষ্ম সুতোগুলো জোড়া লেগে একটা শক্ত সুতোয় পরিণত হয়। প্রজাতি ভেদে সিল্কের গুণাগুণ আলাদা হতে পারে আবার প্রয়োজনের তাগিদেও সিল্কের রকমফের ঘটে। সিল্ক সুতো 0·005 থেকে 0·03 মিলিমিটার মোটা হয়। মাকড়সার তৈরী সুতোকে সিল্ক বললেও এ সিল্ক কিন্তু মথের তৈরী সিল্কের মত নয়। মথের তৈরী সিল্কের মাঝে প্রোটিন 'ফাইব্রোইন' কে ঘিরে থাকে প্রোটিন 'সেরিসিন'। মাকড়সার সুতোয় থাকে শুধুমাত্র 'ফাইব্রোইন'। শীতের সকালে সূর্য ওঠার ঠিক পরে বাগানের গেটে বা ডালপালার মাঝে শিশির ভেজা যে জাল প্রায়ই দেখা যায় তার মালিক হলো 'এ্যারিনাস' গণের মাকড়সা। আর এরাই কিন্তু সবচেয়ে বড় কারিগর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সব প্রাণীই চায় একটা আস্তানা, মানে বাড়ি। মাকড়সারা সাধারণতঃ বাড়ীর দেওয়ালের ফাঁকে-ফোঁকরে, গাছের ছালের নিচে, পাতার আড়ালে, মাটির নিচে বা জলের মধ্যে বাসা বানিয়ে বাস করে এবং সবরকম বাসা তৈরীর মূল উপাদান হলো নিজদেহ নিঃসৃত সিল্ক। 'এটিপাস' গণের মাকড়সা পায়ের নখের সাহায্যে মাটিতে প্রায় একফুট লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরীকরে প্রথমে চারধারের দেওয়ালে সিল্ক ও বালি মিশিয়ে একবার লেপে দেয়। এর উপরে টাঙ্গিয়ে দেয় নরম ফিনফিনে সিল্কের চাদর। এরিস্ট-টনিজিডি গণভুক্ত মাকড়-সারাও 'এটিপাসের' মত মাটির নীচে সুড়ঙ্গবাসা বানায়। কিন্তু এরা ভীষণ চালাক তো তাই প্রয়োজনে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রধান সুড়ঙ্গের গা থেকে এদিক-ওদিক দু-চা র টে সুড়ঙ্গ বানিয়ে রাখে আর প্রধান সুড়ঙ্গের মুখে থাকে একটা ঢাকনা। এতেও খুশী না। শত্রুকে বোকা বানানোর জন্য বাসার মুখ ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখে। এই ধরনের মাকড়সাকে চলতি কথায় বলে 'ট্র্যাপ ডোর' মাকড়সা। অনেক মাকড়সাই খাবারের খোঁজে জলের নিচে যায় কিন্তু বাসা বাঁধে না। কেবল মাত্র ব্রিটেনের 'আর্জিওনেটা' নামের মাকড়সা পুকুর বা হ্রদের শান্তজলের অগভীরে সিল্ক সুতোর খোলস তৈরী করে কোন আগাছার সঙ্গে আটকে রাখে। এবার জলের উপর থেকে বাতাস এনে এই খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। খোলসের সুতোগুলো বাড়া কমা করতে পারায় খোলসটা ফুলতে ফুলতে একটা তাঁবুর আকার ধারণ করে। আর এটাই হলো 'আর্জিও-নেটার' সুখনীড়। শীতকালে এরা বাসাটাকে জলের অনেক নিচে সরিয়ে নেয় অথবা সাময়িকভাবে কোন মরা শামুকের খোলে ঢুকে প্রাণ বাঁচায়।

মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে বাসা তৈরী করছে

মাকড়সার প্রধান খাবার ছোটখাট পোকা। আবার মাকড়সা যে মাকড়সা খায় না তা কিন্তু মোটেই নয়। একটা মজার ব্যাপার হলো এরা গোটা পোকাটাকে খপ্ করে ধরে খপ্ করে মুখে পুরে দেয় না আবার রসিয়ে রসিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়ও না। পারবে কি করে? এদের তো দাঁতালো চোয়াল নেই যে খাবারটাকে চিবিয়ে খাবে। তাই পোকাটাকে জাপটে ধরে মাথায় যে একজোড়া বিষাক্ত হুল আছে সে দুটো সজোড়ে পোকার দেহে ঢুকিয়ে বিষ ঢেলে দেয় ফলে পোকাটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এবার মাকড়সা তার মুখ নিঃসৃত একপ্রকার হজমী রসের সাহায্যে পোকার দেহটাকে নরম করে তার দেহের সমস্ত রস শুষে কেবল দেহের খোলসটাকে ফেলে রাখে। এবার প্রশ্ন হলো এরা খাবার ধরে কি করে। প্রধানতঃ দু'রকম উপায়ে খাবার যোগাড় করতে দেখা যায়। কেউ ধরে ফাঁদ পেতে অর্থাৎ জাল টাঙ্গিয়ে আর কেউবা ধরে ওৎ পেতে বসে থেকে, সুযোগ বুঝে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁতী মাকড়সারা জলের ফাঁদে খাবার আটকে তাকে খায়। এ কাজের জন্য এরা জাল টাঙ্গিয়ে তার মাঝে চুপ করে বসে থাকে আর যেই কোন পোকা উড়তে উড়তে এই জালে আটকে যায় মাকড়সা তখন আনন্দে সদ্ব্যবহার করে। 'এ্যারানিয়া' জাতের মাকড়সা খুব মজবুত একটা জাল তৈরী করে তার সব সুতোয় দেহ নিঃসৃত আঠা লাগিয়ে নিজে একটু দূরে কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং জালে শিকারের উপস্থিতি বোঝার জন্য জালের মাঝখান থেকে একটা শক্ত সিল্কসুতো টেনে এনে নিজের একপায়ের সঙ্গে আটকে রাখে। ব্যাপারটা অনেকটা টেলিফোন লাইনের মত। এবার বেচারী পোকা জালের আঠায় আটকে গেলেই টেলিফোন সুতোর মাধ্যমে চালাক মাকড়সা খবর পেয়ে যাবে ও তর তর করে টেলিফোন সুতোর ওপর দিয়ে এসে মড়মড় করে শিকারের ঘাড় মটকে রস শুষে খাবে। কিন্তু জালে যদি বোলতা, ভীমরুল বা মৌমাছি আটকে যায়

তাহলে মাকড়সার বড়সড় খাবার দেখে আনন্দ হয় ঠিকই কিন্তু বুক দুরদুরও করে। কারণ শিকারের দেহেরহুলফুটানোর আগেই যদি শিকারীর গায়ে হুল ঢুকে যায়! তাই অনেক ভেবে চিন্তে ধীরেসন্তর্পণে মাকড়সা এগিয়ে যায় শিকারের দিকে এবং প্রথমেই তার দেহে হুল না ফুটিয়ে সিল্ক সুতো দিয়ে পোকাটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ও তারপর ধীরে সুস্থে পেট ভরায়। আচ্ছা আঠা লাগানো জালে মাকড়সা নিজে আটকে যায় না কেন? মাকড়সার পায়ের তলা থেকে তেলের মত একরকম জিনিস বেরোয় যার সাহায্যে সে নিজের ফাঁদে নিজে আটকায় না। এভাবে খাবার ধরে খেতে গিয়ে জালের অনেক সুতো ছিঁড়ে যায়। যার জন্য এ্যারিনাকে রোজ রাতে নতুন জাল বুনতে হয়। 'এ্যাজেলিনা' গণভুক্ত মাকড়সা কোপের আড়ালে বেশ ঘন জাল বুনে তার মাঝখান থেকে নিচের দিকে সিল্ক সুতোরনল বানিয়ে তার একেবারে নিচে বসে থাকে। জালে খাবার পড়লে নল বেয়ে উপরে উঠে খাবার খায়। দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের মাকড়সা ভীষণ কুঁড়ে। তারা সন্ধ্যাবেলা মাঠে গিয়ে আঠা মাখানো জাল বিছিয়ে রেখে আসে আর সকালে গিয়ে শিকার সমেত জালটাকে গুটিয়ে ঘরে ফিরে সবাই মিলে মনের আনন্দে খাওয়া-দাওয়া সারে। এরা শুধু পোকাগুলোকেই খায় না সেই সঙ্গে সিল্কের জালটাকেও খেয়ে ফেলে। একজাতের অস্ট্রেলিয়ান মাকড়সা আঠালো জাল নিয়ে লুকিয়ে থাকে আর ধারে কাছে কোন পোকা এলেই তার উপর ছুঁড়ে দেয় ঐ জাল। অস্ট্রেলিয়াতে আরেক ধরনের মাকড়সা আছে যারা প্রায় দু'ইঞ্চি লম্বা শক্ত সিল্ক সুতোর এক মাথা পায়ের নখে আটকে আরেক মুখে এক ফোঁটা আঠা লাগিয়ে সুতোটাকে ঘোরাতে থাকে। ফলে সুতোটা কোন উড়ন্ত পোকার গায়ে লাগলেই সে আটকে যায়। 'এ্যাভিকুলারিডী' গোত্রভুক্ত মাকড়সারা ভীষণ দুর্ধর্ষ। এরা আঠামাখানো জাল গাছের উপরে টাঙ্গিয়ে বাদুড় ও পাখী ধরে তার দেহের রস শুষে খায়।

সুতোর মাথায় আঠা লাগিয়ে মাকড়সা খাবার ধরছে

অন্যদলের মাকড়সা অর্থাৎ যারা জাল বুনতে পারে না তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় 'লাইকোসিডি' গোত্র-ভুক্ত নেকড়ে মাকড়সার কথা। এরা নেকড়ের মত এতো দ্রুত দৌড়াতে পারে যে, নিমেষের মধ্যে ছুটে গিয়ে কোন পোকাকে ধরে ফেলে। 'সলটিসিডি' গোত্রের মাকড়সারা কোন খাবারের সন্ধান পেলে তাকে লক্ষ্য করে চুপচাপ লুকিয়ে বসে থাকে এবং হঠাৎ একলাফে গিয়ে জাপটে ধরে ঐ গোবেচারা পোকাটাকে। এই কাজের সুবিধার জন্য এই ধরনের মাকড়সার আটটা চোখের মধ্যে চারটা চোখ ভীষণ বড়। 'সাইটোডিস' গণভুক্ত মাকড়সা শিকারের গায়ে বিষাক্ত লালা ছুঁড়ে মারে ফলে লালায় আটকে গিয়ে শিকারের আর পালানোর উপায় থাকে না। 'ট্র্যাপ ডোর' মাকড়সার কথা আগেই বলেছি। এরা খাবার ধরার জন্য বাসার মুখে একপাশে লুকিয়ে থাকে। উড়তে উড়তে কোন পোকা ভুল করে এই মাকড়সার ঘরে ঢুকে পড়লেই ঘরের কর্তা সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে এসে শিকারকে রসিয়ে রসিয়ে খায়। 'থোমিসিডি' গোত্রভুক্ত কাঁকড়া মাকড়সারা গাছের পাতা বা ফুলের মধ্যে চুপ চাপ বসে থাকে আর ফুলে কোন পোকা মধু খেতে এলেই খপ্ করে ধরে ফেলে। এই কাঁকড়া মাকড়সারা নিজেদের দেহের রং বদলাতে পারে বলেই সহজেই ফুল বা পাতার রংয়ের সাথে মিশে গিয়ে শিকারকে ঠকায়।

মাকড়সা নিজের বাচ্চা খাচ্ছে

মাকড়সা-খেকো মাকড়সার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 'আরকীয়া' গণের ও 'ইরো ফারকাটা' নামের মাকড়সার কথা। এরা অন্য পোকার তুলনায় বাচ্চা

মাকড়সা খেয়ে বেশী তৃপ্তি পায়। কেরলার মাকড়সা 'এ্যারিয়ামনেস' জাল টাঙ্গিয়ে অপেক্ষা করে এবং কোন বাচ্চা মাকড়সা উড়তে উড়তে এই জালে আটকে গেলেই তাকে খেতে শুরু করে। মাকড়সার ডিমের খোলসের মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা একসাথে বড় হয়। এই সময় কিছু দুষ্টু বাচ্চা নিজের ভাইবোনদের খেতে একটুও দুঃখ পায় না। এর চেয়েও দুষ্টু বাচ্চা আছে 'কিলোটেস' গণে। এরা সুযোগ পেলেই মাকে খেয়ে ফেলে। আবার এও দেখা গেছে মা-মাকড়সা অনেক সময় ডিমের খোলস ও ডিম খেয়ে নেয়। মনে হয় নষ্ট খোলস ও ডিমগুলোকেই এই মায়েরা খায়। নতুবা মা কি কখনো তার ডিম-বাচ্চাকে খেতে পারে!

এতক্ষণ দেখলাম মাকড়সা জ্যান্ত পোকামাকড় ছাড়া খায় না। কিন্তু 'হারপাইলাস ব্ল্যাকওয়ালী' নামের মাকড়সা মরা বা শুকনো পোকা ছাড়া খাবেই না।

এবার চোর মাকড়সার কথা বলি। 'আরগিরোডেস' গণের মাকড়সা অন্য গণভুক্ত মাকড়সার জালে লুকিয়ে বসে থাকে। জালের মালিক একটু অন্যমনস্ক হলেই এরা জালে আটকে-পরা খাবার চুরি করে পালায়। অনেক মাকড়সা ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে কিছু খাবার জালের একপাশে মজুত করে রাখে। কিছু চালাক মাকড়সা চুপিচুপি এসে এই মজুত খাবার নিয়ে পালায়। ভিখারী মাকড়সাও আছে। এরা অন্য মাকড়সার জালে দয়ার পাত্র হিসাবে বাস করে এবং প্রভুর অপছন্দ ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে।

মাকড়সার জীবন বৈচিত্র্যে ভরা। মানুষের মত এদের জীবনেও আছে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও রেষারেষি। ছেলে ও মেয়ে মাকড়সারা বড় হলে বিয়ে করে ছেলে-পেলে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে চায়। 'এ্যাজেলিনা' জাতীয় মেয়ে মাকড়সারা সবচেয়ে ভাল। এরা খাবার ধরার জন্য যে জাল টাঙ্গিয়ে রাখে তার এক কোণায় গোপনে একটা সিল্কসুতো বেঁধে কোন এক বিয়ে-পাগলা ছেলে মাকড়সা জালটাকে নাড়াতে থাকে। মেয়েটা তার জালের ঝাঁকুনির ধরন দেখে বুঝতে পারে কোন ছেলেবন্ধু তার দরজায় এসে কলিং বেল বাজাচ্ছে। সে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বন্ধুকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে যায় এবং এই বন্ধুকে নিয়েই নতুন সংসার পাতে। 'এ্যারেনিয়া' গণভুক্ত মেয়ে মাকড়সারা সে ঠিক এর বিপরীত, মানে ভীষণ দজ্জাল। এই জাতের ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় ভীষণ ছোট এবং মেয়েরাও দারুণ পেটুক। খিদে পেলেই এদের মেজাজ যায় বিগড়ে। এক্ষেত্রেও 'এ্যাজেলিনার' মত ছেলেরা যখন জাল ধরে ঝাঁকি দেয় তখন মেয়েটা ভাবে এই বুঝি জালে খাবার পড়েছে। তাই দেরী না করে ঘুরে ফিরে দেখে। কিন্তু খাবার তো নেই! মন খারাপ করে ঘরে ফিরে যায়। এদিকে ছেলেটাও দমবার পাত্র নয়। সে দুরুদুরু বক্ষে জাল নেড়েই চলেছে। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কোন ছেলেবন্ধু তাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইছে। এই অনুমতি পাওয়াটা পুরোপুরি ছেলেটার কপাল। এই সময় যদি মেয়েটার পেট ভরা থাকে অর্থাৎ মেজাজ ভাল থাকে তবে সে ছেলেবন্ধুকে আদর করে ঘরে ডেকে এনে বিয়ে করবে। আর মেজাজ খারাপ থাকলে এমন তাড়া মারবে যে ছেলেটা পালিয়ে হাঁপ ছাড়বে। বিয়ের পরেও কিন্তু ছেলের কপালে দুঃখ আছে। এই মেজাজী বৌ বিয়ের ক'দিন পরেই বরের দেহের রস খেয়ে শুধু খোলসটাকে জালে আটকে রাখে। ছেলে নেকড়ে মাকড়সার কোন মেয়েকে পছন্দ হলে তাকে ইশারা করে তার মনবাসনা জানাবে। মেয়েটা যদি এই ছেলের রূপে গুণে মুগ্ধ হয় তবেই ইঙ্গিতে তার সম্মতি জানিয়ে দেবে আর তার পরিণতি সুখের সংসার। আরেক ধরনের নেকড়ে মাকড়সার ছেলেরা বেশী চালাক। তারা প্রেমিকার মন পাওয়ার জন্য একটা মাছি সিল্কসুতোর থলিতে ভরে তাকে উপহার দেয়। লাফিয়ে চলা মাকড়সার ছেলেরা প্রেয়সীকে ঘিরে নানান ভঙ্গীতে নাচতে থাকে। এই নাচে প্রেয়সী খুশী হলে বেটার কপাল ভাল নতুবা নাচ মনঃপুত না হলে প্রেয়সী ফিরেও তাকাবে না। সব ছেলেই কি আর বোকা হয়। ছেলে কাঁকড়া মাকড়সা মেয়ে বন্ধুরবন্ধুর কাছে আগে তাকে সিল্ক সুতো দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে তারপর অন্যকাজ।

মেয়ে মাকড়সারা বিশেষ করে 'এ্যারেনিয়া' গণের মেয়েরা বরের সাথে দুর্ব্যবহার করলেও ভাবী বাচ্চাদের সুখশান্তির জন্য ভীষণ চিন্তা করে। এরা পঞ্চাশ থেকে একশো ডিম একত্র করে তার চারপাশে জলে না ভিজতে পারে এমন একটা খোলস বানায়। এই একটা খোলসেও ভয় থাকে। যদি ডিমের ক্ষতি হয়। তাই প্রথম খোলসের বাইরে আরেকটা শক্ত সিল্কসুতোর খোলস তৈরী করে। এবার ডিমভর্তি থলিটাকে কোন গোপন জায়গায় রেখে খাওয়া-দাওয়া ভুলে সারাক্ষণ পাহারা দিতে গিয়ে মা এতো কাহিল হয়ে পড়ে যে ছেলেমেয়ের মুখ দেখার আগেই সে মারা যায়। 'এ্যাজেলিনা' গণের মায়েরা

ডিম পাড়ার আগে কোন গোপন জায়গায় খুব সুন্দর একটা ঘর তৈরী করে। এই ঘরের বাইরের দেওয়ালে

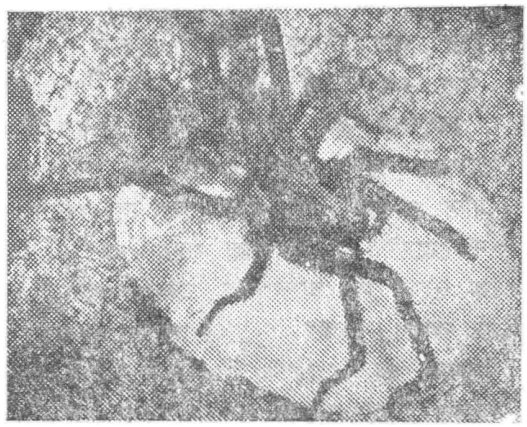

ডিমের থলির উপর বসে পাহারা দিচ্ছে

থাকে শক্ত সিল্কসুতো আর গাছের পাতা এবং ভিতরের দেওয়ালে সিল্কসুতো ও বালি মিশিয়ে গ্যালারি তৈরী করে নরম সিল্ক সুতোর গদি বিছিয়ে রাখে। বাচ্চাদের যদি শুতে কষ্ট হয়! এক্ষেত্রেও ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর আগেই মা মারা যায়। এবার বলি নেকড়ে মাকড়সার কথা। এক্ষেত্রে মায়েরা সৌভাগ্যবতী কারণ ছেলেমেয়ের মুখ দেখে আদর যত্ন করে তবে তারা মরে। এই মাকড়সারাতো ভবঘুরে তাই ডিম ও বাচ্চাদের রক্ষার জন্য কোন ঘর তৈরী করে না। তাই বলে এরা যে সন্তান দরদী নয় তা কিন্তু মোটেও ঠিক না। সিল্কসুতোর আবরণের মধ্যে ডিমগুলো নিয়ে পেটের নীচে আটকে রাখে। এরপর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে সোজা মায়ের পিঠে চেপে বসে। মায়ের এতে কোন আপত্তি নেই। এক গাদা বাচ্চা পিঠে চাপিয়ে দিব্যি ঘুরেঘুরে খাবার শিকার করে বেড়ায়। এই সময় যদি বাচ্চাওয়ালী কোন মায়ের সাথে পথে দেখা হয় তবে নিশ্চয়ই দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দুই মায়ে সুখদুঃখের গল্প করবে। না, মোটেই তা হবে না। দুই মায়ে মুখোমুখি হলেই ভীষণ মারামারি শুরু করে দেয়। ফলে দু'জনের পিঠের বাচ্চারা চারদিকে ছিটকে পড়ে। কেউবা মারাও যায়। মারামারির শেষে একটা মা মারা যায় ও অন্য মা নিজের বাচ্চার সাথে ভুল করে মাতৃহারা বাচ্চা-গুলোকে পিঠে চাপিয়ে আবার চলতে শুরু করে। মায়েরা বাচ্চাদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবলেও বাচ্চাকে কিছু খেতে দেয় না। বাচ্চারা বড় হয়ে যতদিন না পর্যন্ত নিজেদের খাবার যোগাড় করতে পারবে তত দিন একদম উপোস। তবে বাগানে ছোট ছোট কালচে রংয়ের যে মাকড়সা দেখা যায় তারা পোকামাকড় ধরে এনে নিজেরাও খায় এবং বাচ্চাদের খাওয়ায়।

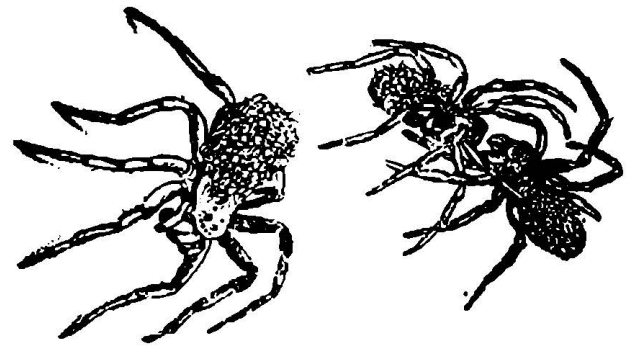

যুদ্ধরত দুই মেয়ে মাকড়সা

নানান বৈচিত্র্যে ভরা মাকড়সার জগতে আরো কত যে রহস্য লুকিয়ে আছে তার খবর আমরা এখনো জানি না। তাইতো এখনো পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মাকড়সার জীবনধারা নিয়ে নানান ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-৬, কলি-৫৪

নিউট্রন মিশ্রিত জ্বালানী

সুনীত রায়

শ্রীরাজা রামান্না, অধিকর্তা, ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র এবং সচিব ভারত সরকারের আণবিক শক্তি দপ্তর বিগত ২১শে নভেম্বর '৮১ যাদবপুরে 'ন্যাশন্যাল সেমিনার অন গ্লাস, সিরামিক অ্যাণ্ড কমপোজিটস্ ইন কেমিক্যাল অ্যাণ্ড আদার ইণ্ডাসট্রীজ্' সংক্রান্ত সভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের কেরলের দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণ 'থোরিয়ামের' সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, সরকারী তরফ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এই 'থোরিয়াম'কে পারমাণবিক জ্বালানী আকারে ব্যবহার করতে। ইতিমধ্যে মাদ্রাজে কালপক্কাম নামে একটি স্থানে একটি সরকারী রিএ্যাকটার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে একটি বিশেষ ধরনের ব্রিভার রি-এ্যাকটারের সাহায্যে এই থোরিয়ামের সাথে নিউট্রনকে মিশিয়ে পারমাণবিক জ্বালানী আকারে ব্যবহার করা যায়।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হোল যে এই থোরিয়াম যখন জ্বালানী আকারে ব্যবহার করা হয়, তখন তার ক্ষমতা 'ইউরেনিয়ামের' চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশি।

পড়াশোনা

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

তারকমোহন দাস

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রকৃতি ॥
একটি বিরাট রসায়নাগার ॥

আমরা গত সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাকে বলে জেনেছি। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিভাবে আমরা কাজে লাগাব? আমরা কি শুধু বিজ্ঞান গবেষণার সময়ই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করব?—না জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করব?—এ প্রশ্ন স্বভাবতই তোমাদের মনে উঠতে পারে। এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই,—প্রকৃতির মধ্যে গাছপালা, পশুপক্ষী সকল জীবই একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃংখলা অনুসরণ করে চলে, তাদের কারুরই জীবন-পদ্ধতি বিশৃংখল, অবিন্যস্ত ও অনির্দিষ্ট নয়,—যা দেখে মনে হয় প্রকৃতির নিজের মধ্যেই একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সব সময় কাজ করে চলেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। মানুষও সেই পদ্ধতির বাইরে নয়। জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ গ্রহণের সময় এটা আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে,—প্রকৃতির সব কিছুই চলে একটা প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে। এই নিয়মের ওপর নির্ভর করেই জীবন ও প্রকৃতি গড়ে উঠেছে ও টিকে আছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার আপন কক্ষপথের ওপর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে আবর্তন করতে করতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে,—যার জন্য দিন-রাত্রির সৃষ্টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটছে, তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে, ঋতু পরিবর্তন ঘটছে, নানারকম ফুল-ফল পাচ্ছি বিভিন্ন ঋতুতে, নানারকম পশু-পক্ষী শাবক ও ডিম প্রসব করছে, তাদের দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন ঘটছে। চন্দ্রও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে ঘড়ির কাঁটা ধরে, যার জন্য পূর্ণিমা-অমাবস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, নদ-নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলছে, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য-গ্রহণ হচ্ছে,—এ সব-এরই পেছনে একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে, একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে,—কোন কিছুই দৈবাৎ ঘটছে না, কোন অলৌকিক ব্যাপারেরও চিহ্ন মাত্র এর মধ্যে নেই।

অথচ যে কোন ভাষার পুরানো পুঁথিপত্র খুলে দেখ, সেখানে দেখবে কত মনগড়া সুন্দর সুন্দর গল্প-উপকথা রয়েছে এই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র নিয়ে। তাদের দেবতা বানিয়ে কতই না রোমাঞ্চকর কীর্তি-কাহিনীর বিবরণ লেখা হয়েছে তাহার সম্পর্কে। কল্পনাপ্রবণ মানুষ বিশেষ কিছু না জেনেই ঐগুলি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে তৈরি করেছিল। ঐগুলি মানুষ এককালে বিশ্বাসও করত, আজও বেশ কিছু মানুষ তা করে থাকে। এই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যগুলি কোনদিনই জানা যেত না যদি না মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিচার না করে দেখত। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই মানুষ আজ সমাজে প্রচলিত বহু অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মারাত্মক ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত সত্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এখনও বহু ভুল ধারণা, কুসংস্কার আছে আমাদের মধ্যে। আমাদের জীবনে প্রতিদিনই এমন বহু সমস্যার সামনাসামনি হতে হয় যার পেছনে কোন যুক্তি নেই, কোন সত্য নেই,—শুধু প্রচলিত বিশ্বাস ও নিছক সংস্কারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা কলের পুতুলের মত কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই তা নির্বিবাদে পালন করে চলেছি। কিন্তু আমরা কেন তা করব? আমরা যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হই, তাহলে প্রত্যেকটি বিষয়ই খোলা মন নিয়ে, তীক্ষ্ম, নিরপেক্ষ দৃষ্টির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে, পরীক্ষা করে তবেই তা গ্রহণ করব। জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যেকটি প্রচলিত ধারণারই পুনর্বিচার করে দেখার প্রবণতা জীবনবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবণতাকে বলতেন 'বিজ্ঞান মানসিকতা।'

জীবনবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে বিশেষ করে বলার দরকার এইজন্য যে তাদের কাছে জীবনবিজ্ঞানের গবেষণাগার শুধু চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা প্রকৃতিই তাদের কাছে একটা বীক্ষণাগার, সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ তাদের সামনে অফুরন্ত। বিজ্ঞানকে টেক্সট বুকের পাতার মধ্য থেকে মুক্ত করে এনে জীবনে প্রয়োগ করার যত বেশী সুযোগ জীবনবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে রয়েছে, তেমন সুযোগ বোধকরি অন্য কোন বিজ্ঞানের শাখার ছাত্রছাত্রীদের নেই। এই সুযোগ কার্যে পরিণত করার ওপরই জীবন-বিজ্ঞান পাঠের সার্থকতা নির্ভর করছে,—সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, সত্যকে অনুসন্ধান করবার জন্য, সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্য নানা দিক গভীরভাবে

চিন্তা করে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। —কিন্তু মূলত এটি প্রকৃতিরই নিজস্ব হাতিয়ার। সাধ্যমত পর্যবেক্ষণ করে, সকল বিষয় সাধ্যমত পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা প্রকৃতির সকল জীবের মধ্যেই অল্প-বিস্তর দেখা যায়, এটিই তাদের বেঁচে থাকবার কৌশল। মানুষ যখনই এই পদ্ধতি অনুসরণে বিরত থেকেছে, নানা অলীক কল্পনার ওপর নির্ভর করে চলতে চেষ্টা করেছে তখনই নানা বাধার সৃষ্টি হয়েছে, নানা কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে, তার চলার গতি ব্যাহত হয়েছে।

প্রকৃতির মধ্যে এই পদ্ধতি কিভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক,—একটি পাখির কথা ধরা যাক, যেমন কাকা,—মানুষের তুলনায় তার বুদ্ধি অতি সামান্য, কিন্তু কি তীক্ষ্ণ তার পর্যবেক্ষণ শক্তি, দূর থেকে কোথায় তার খাদ্য আছে ঠিক খুঁজে বার করবে, কাগজের মোড়কের মধ্যে থাকলে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে দেখবে,—ঘরের মধ্যে খাদ্য থাকলে জানলার ধারে বসে পর্যবেক্ষণ করবে ভেতরে প্রবেশ করা নিরাপদ কি না, তারপর সেইমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকবার জন্য এটাই অধিকাংশ প্রাণীর প্রধান কৌশল বা পদ্ধতি।

প্রকৃতি একটি বিরাট গবেষণাগার

সমস্ত প্রকৃতিকেই মনে করা হয় একটি বিশাল গবেষণাগার। এখানে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বহু রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে,—যার ফলে বহু নূতন জীবের উদ্ভব হচ্ছে, নূতন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা গবেষণাগারে যেমন নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করি, যন্ত্রপাতিগুলি সবসময় উন্নত করবার চেষ্টা করি, প্রকৃতির মধ্যেও ঐ ধরনের প্রয়াস দেখা যায়। প্রকৃতির তৈরী এই যন্ত্রগুলি অধিকাংশই অতি উন্নত মানের,—মানুষের পক্ষে আজও সম্ভব হয় নি ঠিক অবিকল ঐ ধরনের কোন যন্ত্র তৈরী করা বা তার সব কলাকৌশল বুঝে ওঠা। জীবজন্তুর চোখের কথা ধরা যাক,— আমরা একটা যন্ত্র তৈরী করেছি তার নাম ক্যামেরা, অনেকটা চোখের মত এই যন্ত্রটি কাজ করে থাকে। ক্যামেরার লেন্স আছে, চোখেরও লেন্স আছে। ক্যামেরায় লেন্সটিকে সামনে পেছনে সরিয়ে এনে দৃশ্যবস্তুকে ফিল্মের ওপর ফোকাস্ করতে হয়। প্রকৃতির মধ্যে এই পদ্ধতি অতি পুরানো, প্রায় বাতিলের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ব্যাঙেদের চোখের লেন্স এইভাবে কাজ করে,—কিন্তু মানুষের মত উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চোখের লেন্স প্রয়োজন অনুসারে আকৃতি বদলে,—একবার মোটা হয়ে, একবার পাতলা হয়ে এই কাজটি সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করে থাকে। এই ধরনের লেন্সের কথা আমরা আজ চিন্তাও করতে পারি না।

গাছের চোখ নেই, কিন্তু আলোর অনুভূতি ঠিক ধরতে পারে, আলোর দিকে তার ডালপালাগুলি ঠিক বাড়িয়ে দেয়। আর আলোর সাহায্যে সবুজ পাতায় যে কৌশলে শর্করা তৈরী হয় তার টেক্‌নিক্ আমরা আজও আয়ত্ত করতে পারি নি,—যে দিন পারব সে দিন পৃথিবীতে আর খাদ্য সমস্যা থাকবে না। একটি একশ' ফুট উঁচু বিরাট বৃক্ষ কি কৌশলে কয়েক ট্যাঙ্ক জল প্রতিদিন মাটির তলা থেকে ওপরে তোলে তার রহস্য সঠিকভাবে আমরা আজও বুঝতে পারি নি। কিন্তু এক ফোঁটা জল না পেয়েও ছাতের পাঁচিলে একটা বট বা অশ্বত্থ গাছের শীতকালে বেঁচে থাকতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে প্রয়োজন উপস্থিত হলে জলের খরচ কমাবারও তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা আছে। এই বিভিন্ন ধরনের চোখের লেন্স, সবুজ পাতায় খাদ্য তৈরী, এই জলহীন শুষ্ক পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা একদিনে তাহাদের আয়ত্ত হয় নি, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিয়ত প্রচেষ্টা, পরীক্ষা, নির্বাচন ও বর্জনের মধ্য দিয়েই এগুলি আয়ত্ত করতে হয়েছে। প্রকৃতির গবেষণাগারে এই রকম বহু রহস্য, বহু বিস্ময় রয়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে,—যা একমাত্র একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনেই ধরা পড়ে। আমরা যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করি, অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণী যে মাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে,— সেই চোখ, নাক, কান, জিব ও ত্বকের অনুভূতি গ্রহণের ক্ষমতা কত অসীম এবং চেষ্টা করলে ঐ ক্ষমতা কত অসাধারণ পর্যায়ে উন্নত করা যায় তার সঠিক খবর আমরা নিজেরাই জানি না।

একটি ছাত্র নিয়মিত অনুশীলন করলে যেমন হাতে করে তুলে বলে দিতে পারে একটি বস্তুর সঠিক ওজন কত, শুধুমাত্র চোখে দেখেই বলতে পারে একটি বেঞ্চ কতটা লম্বা, একটি দরজা কতটা উঁচু, একটি গাছের পরিধি কত, তেমনি ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে, ত্বকের স্পর্শ অনুভূতির সাহায্যে এমন অনেক কিছু বলা যায় যা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের বাড়ীর নীচের ফ্ল্যাটে এক অন্ধ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা থাকেন, চার বছর বয়স থেকে তিনি অন্ধ। অতি চমৎকার পিয়ানো বাজান। একদিন নিচে নামবার সময় পিয়ানো শুনে দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়েছি

—অন্ততঃ ১৫ ফুট দূরে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন, তিনি আমায় ডাকলেন—ডঃ দাস ঘরে এসে বসুন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি কি করে জানতে পারলেন আমি এসেছি?" তিনি বললেন 'আমি গন্ধ পাই'। আমি কোনদিন সিগারেট খাই না, সেন্টও ব্যবহার করি না, অথচ তাঁর পক্ষে কোন অসুবিধাই হয় নি আমাকে চিনতে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীরা মরুভূমির বালির মধ্যে পায়ের ছাপ দেখে বলে দিতে পারে প্রাণীটির আকার, বয়স, কতক্ষণ আগে এখানে এসেছিল, কোথায় গেছে, ইত্যাদি।

সুতরাং প্রথম শ্রেণীর পর্যবেক্ষক হতে হলে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে প্রকৃতি আমাদের যে সহজাত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়েছে তাকে তীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে উপযুক্ত অনুশীলনের সাহায্যে। পৃথিবীর সকল উন্নত শ্রেণীর প্রাণীই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এই ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে, এটিই তাদের পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুতরাং আমাদেরও এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করতে হবে সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিকভাবে।

প্রতিটি পদার্থের যেমন আয়তন আছে তেমনি তার একটি নির্দিষ্ট ওজনও আছে। আমরা হাতে করে তুললে বুঝতে পারি, কোন্ বস্তুটি ভারী, কোন্ বস্তুটি হাল্কা, তার একটা মোটামুটি ওজনও অনুমান করতে পারি। একটি দাঁড়িপাল্লার বিভিন্ন ওজনের বাটখারাগুলি হাতে তুলে পরে ভাল করে অনুভব করবার চেষ্টা কর নির্দিষ্ট ওজনগুলি। বিভিন্ন ওজনের নানা রকম পদার্থ,—যেমন নানারকম ফল, পাতা, ডিম, বই, খাতা, দোয়াত, কলম, ইত্যাদি হাতে নিয়ে অনুমান কর কত ওজন হতে পারে, তারপর দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করে দেখ তোমার অনুমান কতদূর নির্ভুল হল। অন্ততঃ কুড়িটি পদার্থ এইভাবে পরীক্ষা কর। লক্ষ্য কর তোমার ওজন অনুমান করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়ছে কিনা।

[ক্রমশঃ]

কিশোর-কিশোরীদের চিত্রিত জ্ঞানকোষ

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

কিশোর-বয়সীদের বিশেষ একটি চরিত্রলক্ষণ হল জানতে চাওয়া। তাদের জীবন আর অভিজ্ঞতার মধ্যে যা-কিছু আছে, যা-কিছু ঘটছে—সেই সব-কিছু সম্পর্কে অশেষ জিজ্ঞাসা: কী? কেন? কত? কবে? কোথায়? কেমন করে?

কিশোর-মনের বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর দেওয়ার জন্য; তাদের বস্তুসচেতন, যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান-মনস্ক হতে উৎসাহিত করার জন্য, 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থমালায় একের পর এক অনেকগুলি বই প্রকাশিত হবে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে:
'বানর', 'আগ্নেয়গিরি'।
শীঘ্রই প্রকাশিত হবে:
'আগুন', 'মরুভূমি', 'হিমবাহ'।
রচনার কাজ চলেছে:
'পিরামিড', 'বনমানুষ', 'আদিম মানুষ', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'ভূমিকম্প'।

প্রতিটি বই সাত টাকা। পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে প্রতিটি বই পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থমালারই ইংরেজি সংস্করণ
Little Science Library
প্রতিটি বই আট টাকা। পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে প্রতিটি বই সাত টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: সরোজিনী পুস্তকালয়
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩
চিঠিপত্রে যোগাযোগ এবং ভি. পি.

সংবাদ

প্রকাশন:
১১/১, হরিনাথ
দে রোড, কলি-৯

আবিষ্কারের গল্প

ম্যালেরিয়া রহস্য

বিবেক রায়

আজকের দিনের মানুষের কাছে ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তির কারণ সুবিদিত। সুবিদিত তার প্রতিকার ও চিকিৎসা পদ্ধতিও। কিন্তু আজ থেকে একশো বছর আগেও মানুষ এ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সে সময় ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হ'য়ে নিতান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করেছে। এক ইংরেজ চিকিৎসক ও গবেষকের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে ম্যালেরিয়ার রহস্য উন্মোচিত হয়। প্রকাশিত হয়—ঐ রোগ জীবাণুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র তথ্য।

১৮৫৭ সালের ১৩ই মে তারিখে অবিভক্ত ভারতের উত্তরাংশে কুমায়ুন পাহাড়ের আলমোড়া শহরে এক ইংরেজ শিশুর জন্ম হয়। ঐ শিশুর নাম রাখা হয় 'রোনাল্ড রস'। ছেলেটির বাবা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। বাপের মত ছেলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক হ'য়ে ২৪ বছর বয়সে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন এবং কর্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ান।

ডক্টর রস ভারতের যেখানেই যান, সেখানেই দেখেন মশা আর ম্যালেরিয়া রোগ। কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। তখনও পর্যন্ত মানুষ জানতো না—ম্যালেরিয়া রোগ কি কারণে হয়। তখন ফরাসী সামরিক বাহিনীতে 'চার্লস লাভেরান' নামে এক চিকিৎসক ছিলেন। আলজিরিয়ায় থাকাকালে তিনি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের নমুনা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করেন যে সেই রক্তে কিছু অপরিচিত জীবাণু রয়েছে। লাভেরান কোন সুস্থ মানুষের রক্তে ঐ জীবাণুগুলিকে দেখতে পেলেন না। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে অপরিচিত ঐ জীবাণুগুলি কোনরকমভাবে সুস্থ মানুষের রক্তে মিশে রোগ সংক্রমণ ঘটিয়েছে। অতএব অপরিচিত ঐ জীবাণুগুলি নিশ্চয়ই পরজীবী শ্রেণীর এবং রক্তেই ওদের বাস। আর একটা ব্যাপার লাভেরান লক্ষ্য করেছিলেন। সেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আকৃতি পরিবর্তন করে।

'রোনাল্ড রস' চার্লস লাভেরানের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা জানবার পর ভাবতে লাগলেন—মানুষের রক্তস্রোতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা আসে কি ক'রে? কিছু কিছু পতঙ্গের দংশনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে রোগ সংক্রামিত হয়, এ সত্য তখন মানুষের জানা ছিল। কাজেই রস ভাবলেন—কোন পতঙ্গের দংশনে হয়তো বা ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয়। কিন্তু কোন সে পতঙ্গ? সেটা খুঁজে বের করবার জন্যেই রস এবার উঠে পড়ে লাগলেন।

১৮৯১ সাল। রস তখন বাঙ্গালোরের সামরিক হাসপাতালে কাজ করতেন। ক'দিনের ছুটিতে 'টেইট' নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরুলেন। ফিরবার পথে মাছ ধরবার জন্যে 'মেট্টুপালাইয়ম' নামে এক জায়গায় রাত কাটালেন। ঘাটের ধারে এক জায়গায় এক কুটিরে ওঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। রস মশারি টাঙ্গিয়ে শুলেন রাতে। তাঁর বন্ধু 'টেইট' কিন্তু বিনা মশারিতেই রাত কাটালেন সেই কুটিরে।—এ ঘটনার কিছুদিন বাদেই 'টেইট' আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়া রোগে, কিন্তু রসের কিছুই হলো না। এর থেকে রোনাল্ড রস অনুমান করলেন যে, 'মশা' বোধহয় ম্যালেরিয়া রোগের বাহক। পরীক্ষার দ্বারা অনুমানের সত্যতা যাচাই করতে এবার ব্রতী হলেন রস।

অবিভক্ত ভারতের অনেক জায়গাতে রস ঘুরে বেড়ালেন। সর্বত্রই মশা আর মশা! বাঙ্গালোরেও মশা প্রচুর, অথচ ওখানে ম্যালেরিয়া নেই।—এ ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে তাঁর ধারণা হলো যে, সব জাতের মশা বোধহয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে না। তাহ'লে কোন্ জাতের মশা ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক? সেটা আগে খুঁজে বের করতে হবে।

সেকেন্দ্রাবাদের সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসকরূপে কাজ করবার সময় থেকে রস মশা আর মাইক্রোস্কোপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠলেন। এখানে তিনি দু' জাতের মশার সন্ধান পেলেন। এক জাতের মশা বাদামী রঙের। অন্য এক জাতের মশার ডানায় বাদামীর ওপর অন্য রঙের ছিটে-ফোঁটা দাগ। শেষোক্ত মশারা লেজটি উপর দিকে তুলে দেওয়ালের গায়ে বসে থাকে।

বর্ষাকাল। আবদ্ধ স্থানের জলে তখন মশকীরা ডিম

পাড়ে। কিছুদিন বাদেই ডিম ফুটে বেরোয় লার্ভা বা শূককীট। মশা এবং মশার শূককীট সংগ্রহ করার জন্যে ডক্টর রস কিছু লোক নিয়োগ করলেন। তাদের নাম দিলেন 'মসকুইটো ম্যান'। এরা পথের ধারের খানা-খন্দের আবদ্ধ জল থেকে অজস্র শূককীট জল সমেত বোতলে ভরে নিয়ে এলো। রস তাঁর ঘরের তাকে বোতলগুলিকে পরপর সাজিয়ে রাখলেন। কিছুদিন বাদে তিনি লক্ষ্য করলেন যে ঐ শূককীটগুলি থেকে ডজন-খানেক পূর্ণাঙ্গ মশা বেরিয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকটিই ফোঁটা কাটা ডানাযুক্ত মশা।

এমন সময় সেকেন্দ্রাবাদের সামরিক হাসপাতালে হুসেন খাঁ নামে এক ম্যালেরিয়া রোগী ভর্তি হলো। রস তার মশারির মধ্যে ঐ ফোঁটা কাটা ডানাযুক্ত মশা-গুলিকে ছেড়ে দিলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই গোটা দশেক মশা হুসেন খাঁর রক্ত পান ক'রে ফুলে উঠলো। এ জন্যে রস হুসেন খাঁকে মশা পিছু ছ' পয়সা দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কথা ছিল—হুসেন খাঁ নীরবে মশার দংশন সহ্য করবে, মারবে না একটি মশাকেও। চুক্তি পালনের জন্যে হুসেন খাঁ ডক্টর রসের কাছ থেকে সর্বসাকুল্যে ৬০ পয়সা পেলো। তার মানে লোকটি ১০টি মশার দংশন সহ্য করেছিল।—এ ঘটনা ১৮৯৭ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখের।

ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান ক'রে ফুলে ওঠা ঐ মশাগুলিকে ডক্টর রস সযত্নে ধরে রাখলেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর একটি-দুটি ক'রে ঐ মশার পাকস্থলী কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ১৬ই আগস্ট থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একটি একটি ক'রে রক্ত-খাওয়া মশাগুলির পাকস্থলী কেটে পরীক্ষা ক'রে রস দেখলেন যে মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীদের চার রকম অবস্থান্তর ঘটে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরজীবীরা আকারে একটু একটু ক'রে বড় হয়।

এইভাবে রোনাল্ড রসের বহু প্রত্যাশিত অনুমান এতদিনে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। রস ডানায় ছোট ফুঁটকিযুক্ত মশাদের নাম রাখলেন 'এনোফিলিস'। এরপর আরও পরীক্ষা চালিয়ে ১৮৯৭ সালে রস প্রমাণ করলেন যে, এনোফিলিস জাতীয় মশকীর পাকস্থলী থেকে লালা-গ্রন্থির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা মশকীর মুখে আসে। তারপর সেই মশকী যখন কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করে, তখন ঐ পরজীবীরা সুস্থ মানুষের দেহের রক্তস্রোতে মিশে যায় ও তার দেহে ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত করে। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে রস প্রমাণ করেন যে কিউলেক্স মশার দংশনে পাখির দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয়।

রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ও ১৯১১ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়ে 'স্যার রোনাল্ড রস' নামে পরিচিত হন।

স্যার রোনাল্ড রস শুধু ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি ঐ রোগ দমনের উপায়ও নির্দেশ ক'রে গেছেন তাঁর রচিত 'প্রিভেনশন অফ ম্যালেরিয়া' নামক গ্রন্থে।

আজ ডক্টর রস বেঁচে নেই। ১৯৩২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব 'ম্যালেরিয়া' নামক মারাত্মক রোগটিকে রুখবার হাতিয়ার যুগিয়েছে বিশ্ববাসীকে। তাই স্যার রোনাল্ড রসের নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

খড়্গপুর, মেদিনীপুর

[বিজ্ঞানের টুকিটাকি

সাগর বিজ্ঞানের গবেষণা

সুনীত রায়

বিগত ২০-২১শে নভেম্বর, ১৯৮১ যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'সাগর উন্নয়ন' প্রকল্পনা সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের সাগর দপ্তর এবং কাউন্সিল অফ্ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ [CSIR] যৌথভাবে সহায়তা করেন এবং পরিচালনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলনটি উদ্বোধন করার সময় যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী বলেন, সাগরের নীচে অভিযান চালান এবং সে সম্পর্কিত গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন আছে তার কারণ সাগরের নীচে বহু সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, এই সাগর সম্পর্কিত বিজ্ঞানের চর্চা করা ও প্রযুক্তিবিদ্ তৈরী করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভূমিকা রয়েছে। সরকারের উচিত এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বিভাগ চালু করা। এই সম্মেলনে সি. এস. আই. আর-এর ডাইরেক্টর ডক্টর জি. সিন্ধু, ভারত সরকারের সাগর দপ্তরের সচিব কে. সাইগাল প্রভৃতি ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন।

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

ডিংকু-টিংকুদের কতোদিনের সাধ আজ পূর্ণ হতে চলেছে। ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাবের রানওয়েতে যে ছোট্ট ফকার ফ্রেণ্ডশিপ উড়োজাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে ওটাতেই তারা এক্ষুনি উঠবে। পাইলট হচ্ছেন ওদের প্রিয় ছোটমামা। ছোটমামা ককপিটের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ডিংকু-টিংকু বসেছে ককপিটের বাইরে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে, কোমরে বেল্ট বেঁধে। ছোটমামা প্রথমে পেট্রল মাপার যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন দরকার মতো পেট্রল আছে কিনা। তারপর সুইচ টিপে দিতেই প্লেনের এঞ্জিনটা চালু করে দিলেন। বাইরে এখন প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। এইবার প্লেনটা রানওয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে দিল। তারপর ঘুরে এসে একটা জায়গায় গ্রীন সিগন্যালের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রীন সিগন্যাল পেলে তবেই প্লেন আকাশে উড়তে পারবে।

ডিংকু-টিংকু প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। কি রকম একটা শিহরণ লাগছে ওদের মনে। একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি। ঠিক যেন ডানা মেলে পাখীর আকাশে ওড়ার মতো মুক্তির একটা স্বাদ!

দেখতে দেখতে গ্রীন সিগন্যাল জ্বলে উঠল রানওয়ের দু'পাশে। ছোটমামা প্লেনের স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে ওটা এখন। ছোটমামা তাঁর সামনে যে কণ্ট্রোল স্টিকটা থাকে সেটাকে কোলের কাছে নিয়ে এলেন। আগেই বলা হয়েছে কণ্ট্রোল স্টিকের সাথে এলিভেটরের যোগ আছে। কাজেই স্টিকটা টানলে এলিভেটর উঠবে। আর এলিভেটর ওঠা মানেই প্লেনের মাথা উঁচু হয়ে তখুনি আকাশে উঠবে। হলোও তাই।

ডিংকু-টিংকু আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। নীচের দিকে ঘরবাড়ী, গাছপালা সব কতো ছোট দেখাচ্ছে। আর নীচের বিজলী বাতিগুলো দেখে মনে হচ্ছে বিশাল সমুদ্রের বুকে কে যেন রাশি রাশি প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ছোটমামার পিছনে ডিংকু-টিংকু কখন এসে দাঁড়িয়েছে। মামা বললেন—আমরা এখন মাটি থেকে কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছি বলতে পার? ডিংকু-টিংকু এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে এমন সময় ছোটমামা একটা গোল যন্ত্রের দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—এটার নাম অলটি-মিটার। এর থেকে উচ্চতা মাপা যায়। আমরা এখন মাটি থেকে নয়শো ফুট উঁচুতে রয়েছি।

ছোটমামা এইবার কণ্ট্রোল স্টিকটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন। এবার কি হবে বলতো? তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এর ফলে এলিভেটর নীচু হয়ে যাবে আর তখন বাতাস তাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে তুলবার চেষ্টা করবে। প্লেনের মাথাও তখন নীচুমুখি হবে—অর্থাৎ মুখ নীচু করে প্লেনটা মাটিতে নামতে চাইবে।

ডিংকু-টিংকু চিৎকার করে বলে উঠল—এখন নামতে চাইনে ছোটমামা, আরও কিছুক্ষণ মজা করে উড়ব।

ছোটমামা এবার স্টিকটাকে কোলের কাছে টেনে এনে তারপর আবার মাঝামাঝি জায়গায় রেখে দিলেন। প্লেনটা প্রথমে আকাশমুখী হ'ল—খানিক বাদেই আবার চমৎকার ভাবে একই লেভেলে উড়তে থাকল।

মাটি থেকে প্লেন যখন আকাশে ওড়ে তখন তাকে বলে টেক-অফ আর যখন ওটা আকাশ থেকে নীচে নামে তখন বলা হয় ল্যাণ্ডিং।

ছোটমামা সেদিন প্লেনে বসে নানান মজার খেলা দেখিয়ে ওদের অবাক করে দিয়েছিলেন। সেগুলো হচ্ছে আকাশ পথে প্লেনকে নিয়ে ভানুমতীর খেলা। কখনও হাফরোল, কখনও বা লুপ বা ফ্লিক রোল।

ডিংকু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ছোটমামা, আকাশে প্লেনে করে ওড়ার সময় তোমরা পথ চিনতে পার কেমন করে?

ছোটমামা বললেন—আমরা যখন কোনও রাস্তা চিনে রাখি তখন সেখানকার গাছপালা, বাড়ী, দোকান, সাইন-বোর্ড, ক্লাব এইসব মনে করে রাখি। ভবিষ্যতে ঐ পথে চলবার সময় রাস্তার এইসব জিনিসগুলোই আবার আমাদের পথনির্দেশ করে।

সীমাহীন আকাশ পথে চলবার সময় বৈমানিকদেরও মাটির পথে চলবার মতোই কতগুলো জিনিস মনে করে রাখতে হয়। এরা হোল মধ্যদিনের রক্তনয়নকরা সূর্য, রাতের আকাশের নক্ষত্রের রূপালী তারার দল, বেলা-ভূমি অথবা পাহাড় থেকে সাগর অভিমুখে ছুটে চলেছে যে পাগল পারা নদী—এইসব। এসবই বৈমানিককে পথনির্দেশ করে যখন স্বাভাবিক আবহাওয়া থাকে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে তখন প্রকৃতির উপর পুরো-পুরি ভরসা করা যায় না। তখন বৈমানিককে নির্ভর

করতে হয় আধুনিক আবিষ্কৃত নানারকম সব যন্ত্রপাতির উপর।

ছোটমামা ডিংকুকে বললেন—আমি একটু আগে বেতারযন্ত্রে দমদম এয়ারপোর্টের সাথে কথা বললাম। আমার এক বন্ধু ওখানে কণ্ট্রোল টাওয়ারে রয়েছেন। ওঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আমি ঠিক কোন্ দিকে আছি তা বলতে। আমার বেতার-প্রেরক যন্ত্র থেকে ক্রমাগত পনের সেকেণ্ড বেতার 'ঢেউ' পাঠালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি জানিয়ে দিলেন পশ্চিম দিক থেকে চল্লিশ ডিগ্রী পূবে আমরা রয়েছি।

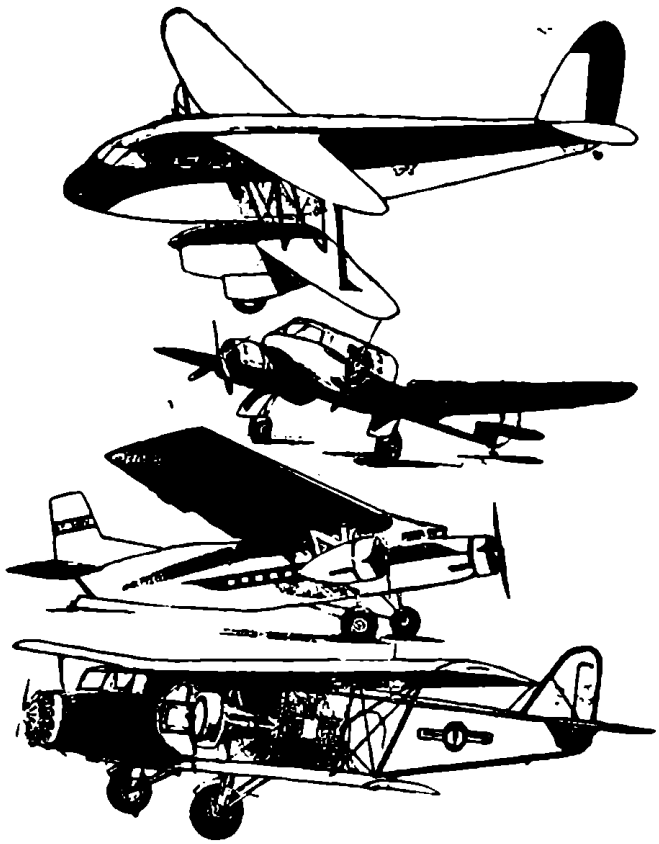

নানারকমের এরোপ্লেন

ছোটমামা বলে চললেন—পাইলটদের সব সময় কণ্ট্রোল টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। কণ্ট্রোল টাওয়ার আকাশে কত উঁচু দিয়ে বৈমানিক প্লেনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা বলে দেন। যেমন ধরো, আমি কোলকাতা থেকে দিল্লীর দিকে এগুচ্ছি দু'-হাজার ফুট উপর দিয়ে। আর একটা প্লেন দিল্লী থেকে উল্টোদিকে কোলকাতার দিকে আসছে। কণ্ট্রোল টাওয়ার তাকে অবশ্যই পথনির্দেশ দেবেন এক হাজার, বারশো ফুট বা ঐরকম উচ্চতা দিয়ে এগুবার জন্য। আকাশপথে এরোপ্লেন চালানোর ক্ষেত্রে এই উচ্চতা ঠিক রাখার ব্যাপারটা খুবই জরুরী, সন্দেহ নেই।

পাইলটের ঠিক সামনে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র থাকে। এর নাম রেডিও কম্পাস। এরোড্রামের বেতার ঘাঁটি থেকে বেতার-প্রেরক যন্ত্রের (Radio Beacon) সাহায্যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যাঁরা এরোপ্লেন চালান—তাঁদের এইসব নানাধরনের বেতার ঢেউ-এর চেহারা কেমন তা আগে থেকে জেনে রাখতে হয়। পাইলটের সামনে যে রেডিও-কম্পাস যন্ত্র থাকে তার সাহায্যে ঐ Radio-Beacon যে সমস্ত বেতার ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা ধরে ফেলা হয়। এর থেকে এরোপ্লেন তার দিক নির্ণয় করতে পারে। কোনও বেতার-ঘাঁটি থেকে আকাশে এরোপ্লেনের দূরত্ব ও সঠিক অবস্থান জানা যায় রাডার (RADAR) যন্ত্রের সাহায্যে। রাডার শব্দের অর্থ হোল 'Radio Detection and Ranging'

শহরে যেমন রাজপথ আছে—আকাশেও তেমনি রয়েছে বেতার-পথ। অবশ্য এই বেতারপথ মানুষই তৈরী করেছে। বেতার ঘাঁটি থেকে নানান ধরনের বেতার ঢেউ আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এইসব অদৃশ্য বেতার ঢেউ-এর কোনও একটা পথ ধরে কণ্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ মত এগিয়ে চলবে বৈমানিক। এরোপ্লেনের বেতার গ্রাহকযন্ত্র এই সমস্ত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউকে বন্দী করে ফেলে। তখন পাইলটের ভারী সুবিধা—ঐ নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউ-এর পথ ধরে সে এগিয়ে চলবে।

এরোপ্লেন এরোড্রামের কাছাকাছি চলে এলে ওখানকার সার্চ লাইটের সাহায্যে বুঝতে পারে সেটা কোন্ স্টেশন। এরোপ্লেন রানওয়েতে ল্যাণ্ডিং করবার সময়ও বেতার সংকেতের সাহায্য নেওয়া হয়। রানওয়ের দু'পাশে যে বেতারযন্ত্র বসানো থাকে তার থেকে যে বেতার সংকেত ছড়িয়ে পড়ে তা রানওয়ের ঠিক মাঝখানে এসে পরস্পর মিশে যায়। বাঁ-দিকের বেতার সংকেত হ'ল টরে এবং ডান দিকের হ'ল টক্কা। এরোড্রামের কাছাকাছি এসে বৈমানিক এরোপ্লেন থেকে এক ধরনের বেতার সংকেত ছাড়ে। এই সংকেত রানওয়ের দু'ধারের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। তারপর সেখানে ডাইনে-বামে টক্কা-টরে সংকেত ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সংকেত ধরে বৈমানিক

খুব সহজেই রানওয়ের ঠিক মাঝখানে নামতে পারে আশ্চর্য উপায়ে।

রানওয়ের ঠিক মাঝখানে কতটা ঝুঁকে নীচে নামতে হবে তা সঠিকভাবে জানার জন্যে বৈমানিকদের আরও একধরনের বেতার যন্ত্রের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্লেনটা রানওয়ের যে দিকে নামছে তার উল্টোদিকে একটা ট্রান্সমিটার থাকে। এই ট্রান্সমিটার থেকে দু'-ধরনের বেতার-ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে রানওয়েতে দু'পাশে। এর ফলে বৈমানিক রানওয়ের ঠিক মাঝখানটা কোথায় তা পরিষ্কার বুঝতে পারে। এছাড়া রানওয়ের লাইনটা নিরাপদে ছোঁবার জন্যে আর একটা ট্রান্সমিটার বসান থাকে মাটিতে– ঠিক যে জায়গায় এরোপ্লেন মাটি ছুঁতে যাচ্ছে তার পাশে। এই যন্ত্র দুটির সাহায্যে খুব সহজেই বৈমানিক তাঁর এরোপ্লেন নিয়ে নিরাপদে ল্যাণ্ডিং করতে পারে। অন্ধকার রাতে ল্যাণ্ডিং-এর সময় রানওয়ের দু'-পাশে আলো জ্বলে ওঠে। এর নাম Flare path— তাছাড়া এরোপ্লেনের নীচের সার্চ-লাইটও অন্ধকারে রানওয়ের উপর নেমে আসতে সাহায্য করে।

ডিংকু বলল—ছোটমামা, অনেক সময় খবরের কাগজে দেখা যায় অমুক প্লেন গতকাল থেকে নিখোঁজ হয়েছে। এই রকম প্লেন হারিয়ে যাওয়ার মানে কি? সেটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে না অন্য কোথাও নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে?

ছোটমামা বললেন—নিখোঁজ প্লেনটি দুর্ঘটনায়ও পড়তে পারে। হয়ত বা কোনও কারণে প্লেনের বেতার যন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়াতে পাইলটের সাথে কণ্ট্রোল টাওয়ারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে বেতার যন্ত্র ঠিক আছে কিন্তু এরোপ্লেনের এঞ্জিন খারাপ হয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও আকাশে বড় বড় পাখী যেমন বাজ, শকুন, ঈগল এরোপ্লেনের এঞ্জিন অথবা ডানার প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া আরও নানা কারণে এরোপ্লেনকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে কোনও অচেনা জায়গায় নেমে পড়তে হয়। না হলে হয়ত আকাশেই ওটা জ্বলে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে যেত।

কোনও এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় পড়লে কতকগুলো আন্তর্জাতিক সংকেত ব্যবহার করে।

পর্ষদ অনুমোদিত নতুন বই

১৯৮২

ডঃ নন্দী, সেন, ও নন্দী প্রণীত ॥ **মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান** ৯ম
Vide T. B/No/IX/L. S/81/7 Dated 10. 1. 81

অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ **ইতিবৃত্তিকা** ৮ম
Snbmission No Syll/H/VIII/81/65 Dateb 10. 12. 81

অধ্যাপক নীরেন সেন প্রণীত ॥ **ভূগোল পরিচয়** ৮ম
Vide Notification No T. B/Syll/G/VIII/81/3 Dated 21. 12. 81

অধ্যাপক নন্দী ও নন্দী প্রণীত ॥ **প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয়** ৭ম
Submissiou No Syll/L.S/VII/81/84 Dated 10. 12. 81

নমুনা কপির জন্য লিখুন ॥ দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস্
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭ ফোন ঃ ৩৪-৮৫৪৩

সিদ্ধার্থ ঘোষ

মাখন স্যার্ আজ আসেননি। শেষ পিরিঅড্‌টা তাই হল না। বিল্টুকে একধারে টেনে এনে বললাম, 'ফুটবল পিট্‌বি না বাড়ি যাবি? ঝন্টু মামা—'

আর বলতে হল না। বিল্টুর চোখ দুটো নেচে উঠল, 'সেই ভাল। ঝন্টুমামা নিশ্চয় এতক্ষণে ফিরে এসেছে।

চুপিসারে দু'জনে সট্‌কে এলাম ফুটবলের মাঠ ছেড়ে। বিল্টুর ঝন্টুমামার কথা আমরা বন্ধুদের কাছে বলিনি। সবাই তো সব জিনিসের কদর বোঝে না। হঠাৎ যদি দুম্ করে কেউ বেফাঁস কিছু ব'লে বসে বা হাসি চাপতে না পারে—কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। ঝন্টুমামার গবেষণাকক্ষে ঢোকাটাই হয়তো তখন চিরকালের মতো বরবাদ হয়ে যাবে। কতদিন ধরে কত পরীক্ষা দিয়ে তবে না আমরা দু'জন ওই ঘরে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছি। এ তো জানা কথাই যে সব প্রতিভাধর মানুষেরই একটু আধটু পাগলামি থাকে। কিন্তু সেটা নিয়ে হাসাহাসি আহাম্মুকেরাই করে। না না, আহাম্মুক বলা ঠিক নয়। তাহলে আবার বিল্টুর মামার বাড়ির লোকেরা চটে যাবে। কারণ বিল্টুর মামার বাড়িতেও কেউ ঝন্টুমামার কদর বোঝেনি। ভাগ্যিস বিল্টুর বাবা ঝন্টুমামাকে নিজের বাড়িতে এনে গবেষণাগার তৈরি করার সুযোগ দিয়েছিলেন। না হলে কি আর মামা থাকত এ-দেশে! নিশ্চয় নাইরবি কি কুয়ালালামপুর চলে যেত। হ্যাঁ তাই। আমেরিকা ইংল্যাণ্ডে যাবার পাত্র নয় ঝন্টুমামা। ভারত যদি ছাড়তেই হয় তো ভারতের মতোই কোনো গরীব দেশের উপকারে লাগবার চেষ্টা করবেন। না, ঝন্টুমামা নিজের মুখে একথা বলেননি। তিনি তো গড়ফার স্কুলে মাস্টারিটা ছাড়বার কথাও চিন্তা করতে পারেন না। তবে সব কথাই কি আর মানুষকে বলতে হয়। ঝন্টু মামা পুঁথির পাতা আর কাগজে-কলমে বিজ্ঞান নিয়ে মেতে থাকার লোক নন। তাঁর মতে আমাদের দেশের প্রতিটি বিজ্ঞানীকে কারিগরও হতে হবে। ফলিত বিজ্ঞানী হতে হবে—বিজ্ঞান যাতে সাধারণ মানুষের জন্য ফল ফলাতে পারে।

বিল্টুদের বারান্দায় বসে আছি দু'জনে। মুড়ির বাটি কখন খালি হয়ে গেছে। দু'তিনবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছি মামার ঘরের মধ্যে। ওহ্—এমন ইন্টারেস্টিঙ ঘর আর হয় না। কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম, কলকব্জা। শিশি বোতল ব্যাটারি ফানেল কুপি। পুলি গিয়ার শেকল দড়ি। হাতুড়ি কাতুড়ি তাতাল তুরপুন। গবেষণাগারের সবই অভিনব। এখানে সময় মাপা হয় জলঘড়িতে। টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে বালতিতে, আর জল যত বাড়ছে তত ঠেলে তুলছে একটা ফাঁপা পেতলের চোঙা। এই চোঙার গায়ে লাগানো দাঁতকাটা ডাণ্ডাটা ঘোরাচ্ছে একটা গীয়ার। আর গীয়ারের কেন্দ্রে জোড়া রয়েছে মিনিটের কাঁটা। সব মামার হাতে তৈরি। মোমের চোঙা লাগানো 'কলের গান'-ওটা দেখবার মতো। গলাটা একটু খোনা শোনায় তাছাড়া ঘড়ি মোটরের স্প্রীংটা নরম হয়ে গেছে বলে দমটা একটু কম নেয়। তা হোক্—এটি ছাড়া আর কি কেউ আছে যে টেপ্ রেকর্ডারের সঙ্গে কম্পিট করতে পারে! ও হ্যাঁ, মামার গবেষণাগারে অ্যাসিটিলিনের আলো জ্বলে। কখনো সখনো আর্ক ল্যাম্পও।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বেমালুম দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু মামা আবার উঁকি-মারা কৌতূহল পছন্দ করেন না।

'ব্যাপার কি বল্‌তো সন্তু, এখনো ফিরছে না কেন?' বিল্টুও দেখছি অধৈর্য। 'ফুটবল খেলাটাও—'

কথা শেষ করতে হল না। মামা আসছেন। কিন্তু এ কী চেহারা! হাতে বীকার্‌টা না থাকলে চিনতেই পারতাম না (মামা বীকারেই চা খান এবং ওটা মোড়ের দোকানেই জমা থাকে)। উস্কোখুস্কো মাথার চুল—পাঞ্জাবির ডান হাতটা এমনভাবে ছিঁড়ে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে টিকটিকির লেজ-খসার মতো একটা কাণ্ড ঘটতে পারে।

হন্ হন্ করে আসছিলেন মামা। আমাদের লক্ষ্য

করেননি। চা ভর্তি বীকারটা বাঁ হাতে নিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করলেন। আমরা গুডবয়ের মতো চুপটি করে পেছনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এক হাতে চাবিটা নিয়ে কিছুতেই আর তালার ফোকরটাকে ম্যানেজ করতে পারছেন না। চাবি আর তালা চোর-পুলিশ খেলতে শুরু করেছে। এতো আর যে-সে তালা নয়, ষোড়শ শতাব্দীর পার্সীয়ান তালার ড্রয়িঙ অনুযায়ী মামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পিটিয়ে তৈরি করে এনেছেন হিমু কামারের দোকান থেকে।

বিল্টু এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'মামা, ধরব বীকারটা?'

'কে!' মামা চমকে পিছন ফিরলেন। 'অ! দুই মক্কেলই হাজির। ধরাব না তো কি করবি? এতক্ষণ মজা দেখছিলি নাকি?'

বিল্টুর হাতে বীকারটা দিয়ে তালায় চাবি ঘোরাতেই—'ওরে বাস্—গেছে গেছে গেছে—' মামা ডান পা শূন্যে তুলে বাঁ পায়ের ওপর দু'তিন লাফ নেচে নিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়লেন। মুঠো ক'রে পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরেছেন। আগেই বলেছি— অসাধারণ তালা। চোর যদি কায়দা করে কখনো তালাটা খুলেও ফ্যালে তবু নির্ঘাৎ জখম হবে। চাবি ঘোরানো মাত্র তালা নামে পাঁচ সেরী বিশুদ্ধ লৌহখণ্ড সড়াৎ করে খসে পড়বে। সাধারণ তালার একদিকের পাটিতে যেমন কব্জা থাকে এখানে তা নেই।

মামার জখম খুবই সামান্য। ঘরে ঢুকেই তিন ঢোকে চা শেষ করে ফেললেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝলি তো—চোরেদের আঘাত করার ব্যবস্থা করলে নিজেদেরও ব্যথা পেতে হয়। এটাই ন্যাচারাল্—আফটার অল্ চোরও তো মানুষ। বল্?'

'ঠিক বলেছেন।' আমরা একযোগে বলে উঠলাম।

'কিন্তু তোরা এমন অসময়ে যে? জানিস তো, সন্ধে ছ'টা থেকে আমার কাজের সময়।'

'আমরা সেই চারটে থেকে —', পাছে বিল্টুর কথা শুনে মামা আবার ক্ষেপে ওঠেন তাই কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম, 'ঝন্টুমামা, আপনার পাঞ্জাবি যে ফরদাফাঁই—'

'অ্যাঁ! ছিঁড়ে গেছে? তাই তো!' দেখেই মামার ভুরু কুঁচকে গেল, 'কেন ছিঁড়বে না শুনি? ছেঁড়াই তো উচিত। সেইটাই তো ন্যাচারাল। আফটার অল্ সুতি দ্রব্যের শিয়ারিঙ বা টেন্‌সাইল্ স্ট্রেঙথ্ যা তাতে বাসের ভিড়ে—ওফ্!'

'সত্যি বাসে যা ভিড় বাড়ছে দিন দিন। নিশ্চয় সেইজন্যেই আপনার ফিরতে এত দেরি হয়ে গেল, তাই না?' বিল্টু বলল।

'হ্যাঁ, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!'

'আচ্ছা মামা, আপনি তো ইচ্ছে করলেই রকেট গাড়ির মতো একটা কিছু তৈরি করে ফেলতে পারেন।' হঠাৎ আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়ল।

'কি বললে?' মামার মুখের চেহারা দেখে ভয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে খরগোশ। বেশ বুঝতে পারছি বিল্টেটা মনে মনে হাসছে। 'রকেটের তুমি কি বোঝো হে?' মামা চেপে ধরলেন। 'জানো কে রকেট তৈরি করেছিল?'

'জানি মামা। গডার্ড সাহেব!' বিল্টুটা এমন বিচ্ছু আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিল।

'গডার্ড সাহেব! সবই সাহেবরা করেছে, না? তোদের এডুকেশান সিস্টেমকে গঙ্গাজলে চান করিয়ে আনা দরকার।'

মামার ধমক শুনে কি ভাল যে লাগল। বিল্টু আড়-চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ঠিক হয়েছে, ফলাও আরো বিদ্যে।

হঠাৎ মামার গলার সুর পালটে গেল, 'যাক্ গে, তোদের আর ব'কে লাভ কি। তবে জেনে রাখ্, আমাদের টিপু সুলতানও যুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই প্রথম রকেটের ব্যবহার।'

আমি নিচু গলায় বললাম, 'না, মানে, বাসে-ট্রামে বড্ড ভিড় তো, তাই আপনি যদি কোনো নতুন ধরনের গাড়ি তৈরি করেন—'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তোমাদের মাথায় এখন সুপারফাস্ট যানবাহনের কথা ঘুরছে। এইজন্যে বলি মেলাই বিদেশী সিনেমা দেখিসনি। লিনিঅর্ রেল্—জেট্ প্রোপালশান্—আজ্ঞে না, আমি ওপথ মাড়াব না। এটা তো জাপান বা আমেরিকা নয়। তবে হ্যাঁ—তোরা শুনলে খুশি হবি আমিও এই পরিবহণ সমস্যা নিয়ে চিন্তা ও কর্ম শুরু করেছি। তবে সেটা সুপারফাস্ট নয়, সুপার চীপ্। অতি দ্রুতর বদলে অতি শস্তা। বুঝলি না? ওই দ্যাখ্—'

মামার আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখি উত্তরের দেওয়ালে একটা বিরাট গজাল পোঁতা। তার থেকে একটা হ্যাঙারে মামার পাঞ্জাবি ঝুলছে আর ঝুলছে একটা দড়ি বাঁধা সাইকেলের চাকা। টায়ারটিউব সমেত রিমটা। শুধু চাকাটা দেখে কিছুই মাথায় ঢুকল না।

'মোটরিয়াল সংগ্রহ শুরু করেছি, বুঝলি? হ্যাঁ, ভালকথা এই বিল্টে, তোর্ প্যারাম্বুলেটারটা কোথায় রে?'

আমি অবাক হয়ে বিল্টুর দিকে তাকাই। চোদ্দ বছর বয়সেও বিল্টু প্যারাগ্লাইডার চড়ে জানতাম না। বিল্টুরও দেখছি মুখ হাঁ।

'তুই যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লি। প্যারাগ্লাইডার তো চড়তিস একদিন, নাকি? জিজ্ঞেস করছি সেটা গেল কোথায়?'

বিল্টুর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, 'আছে। আছে। মনে পড়েছে। চিলেকোঠায় ঠাকুমার ঠাকুর ঘরের মাথায় চাতালটার ওপর তোলা আছে।'

'আস্তে আস্তে। চেঁচাচ্ছিস কেন। একবার যদি কানে যায়—শোন্, এইবেলা ছুটে ওপরে চলে যা। কেউ নেই এখন। নিয়ে আয় ওটা।' মামা নির্দেশ দেন।

আমি দেখলাম, মামা উঠে দাঁড়িয়ে দাবার বোর্ডে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলাম,' বিল্টু, একা পারবি তো?'

'উঁহু। উঁহু। তোমার যাবার কোনো দরকার নেই। ও আসুক—ততক্ষণে এক হাত হয়ে যাক্ আমাদের। শোন্, পুরো প্যারাগ্লাইডারটা আনা দরকার নেই। যে কোনো একটা চাকা খুলে আনাব। বেশ মজবুত দেখে একটা।'

বিল্টু মুচকি হেসে পালাল। শুরু হয়ে গেল খেলা। খেলা তো নয়—শিক্ষা। আর শিক্ষা মানেই ধমক—মাথা খাটাও, মাথা খাটাও। মামার মতে দাবা না খেললে মনের একাগ্রতা আসে না আর একাগ্রতা ছাড়া বিজ্ঞান-চর্চা অসম্ভব।

পরের দিন উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম বিল্টুর জন্য। গাড়ি তৈরির খবর নিতে হবে। কিন্তু বিল্টু বাবাজী এলেনই না। পরের দিনও তার পাত্তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ মনে হল, মামা নিশ্চয় বিল্টুকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্ব দিয়েছে। আর বিল্টুও হংসুটের মতো আমার কাছ থেকে সেটা চেপে রেখেছে। পরের দিনই স্কুলে আসার পথে চলে এলাম বিল্টুদের বাড়ি।

ভেতরে ঢুকে দেখি বিল্টু সিঁড়ির পাশে একটা ছোট্ট টুল আর টেবিল নিয়ে বসে আছে। আমায় দেখেই তাড়াতাড়ি একটা বই চালান করে দিল টেবিলের তলায়। তারপর বলল, 'ও। তুই। মা ভেবেছিলাম।'

'ফেলুদা পড়ছিলি নিশ্চয়?'

'নারে। শঙ্কু।'

'কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি?' বিল্টু গবেষণাগারে ঢুকতে পারনি দেখেই আমার রাগটা পড়ে এসেছিল।

'এই দ্যাখ্ না—' বিল্টু টেবলের ওপর চাপা দিয়ে রাখা একটা কাগজ দেখাল। লাল ফেল্ট পেন্ দিয়ে বড় বড় ছাঁদে লেখা দুটো নম্বর—১০১ আর ২৪-২২২২।

'কাগজটা নিয়ে হাঁ করে বসে আছিস কেন? আর সিঁড়ির ধারে—'

'বাবা বলেছেন। যতক্ষণ মামা সাইকেলের ফ্রেম বানানোর জন্যে ওয়েল্‌ডিঙের কাজ করবে একজনকে রেডি থাকতে হবে। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেছে তাই আমি আছি। এই জন্যেই তো দু'দিন স্কুলে যেতে পারিনি। এখানে বসে গবেষণাগারের ওপর ভালভাবে নজর রাখা যায়।'

'কি বলছিস কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'বুঝলি না? ও দুটো ফায়ার ব্রিগেডের নম্বর। দরকার পড়লেই যাতে ছুটে গিয়ে ফোন্ করে দিতে পারি।'

'অ্যাঁ।'

'নয়তো কি। ওয়েল্‌ডিঙ কি সোজা কাজ। তবে যাই বল্—সাইকেলটা যা হচ্ছে না, হয়েই গেছে বলা যায়। একবার উঁকি মেরে যেতে পারিস! তবে খুব সাবধান, মামার মুখোমুখি পড়ে গেলে কিন্তু সব বানচাল হয়ে যাবে। তিন জায়গায় হাত পুড়েছে—বুঝতেই পারছিস তো কত ধকল।'

'হুঁ—কিন্তু কি যেন বানচাল হবার কথা বলছিলি?'

'ও হ্যাঁ—ওইটাই তো আসল কথা। এই রবিবার আমরা সাইকেল অভিযানে বেরোচ্ছি। বুঝলি তো? বাবা পারমিশান দিয়েছে। তুইও ম্যানেজ করে নিস্। বারাসাতে আমাদের দেশের বাড়িতে যাব। তোর তো সাইকেল আছেই। মামা যাবে নতুন সাইকেলে। ট্রায়াল্ রান্।'

বারাসত এমন কিছু দূর নয়। আরও ঘণ্টা দুয়েক বাদেও আমরা যাত্রা শুরু করতে পারতাম কিন্তু মামা কিছুতেই রাজী হননি। বারাসতে পৌঁছেই তিনি মাছ ধরতে বসবেন পুকুরঘাটে। আগেই খবর পাঠান হয়েছে বারাসতে। ভোর পাঁচটায় রওনা হতে হবে শুনে রাগ ধরে গেছিল কিন্তু এখন বুঝছি এতে মঙ্গলই হয়েছে। মামার সাইকেলটা যেভাবে আমাদের আকর্ষণ করছে তাতে দিনের বেলায় হলে রাস্তায় কিরকম লোক জমত বেশ বুঝতে পারছি। ভোর হবার আগেই কলকাতা ছাড়তে

না পারলে বিপদ আছে। শহরতলির লোকেও অবাক হবে কিন্তু খাঁটি কলকাতাবাসীরা অবাক হলেই যেরকম সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, সেরকম করবে না নিশ্চয়। মামার সাইকেলের সামনের চাকাটা প্রমাণ সাইজের কিন্তু তারপরেই সাইকেলের ফ্রেমটা পিছনের দিকে লেজের মতো সরু হয়ে ঝুলে পড়েছে আর সেই লোহার লেজের একেবারে নীচে রয়েছে ছোট্ট একটি চাকা—বিল্টুর প্যারাম্যুলেটার থেকে সেটা খুলে নেওয়া হয়েছে। ঝন্টুমামা চড়ে বসেছেন সামনের বড় চাকাটার কাছ ঘেঁষে ফিট্ করা সীটটার ওপর। সাইকেলের প্যাডেল জোড়াও সামনের বড় চাকাটার সঙ্গে লাগানো। ফলে, চেন স্প্রকেটের কোনো বালাই নেই। সাইকেলের চেহারা আরো খুলেছে হ্যাণ্ডেলের বদলে খেলনা-গাড়ির স্টিয়ারিঙ লাগানোয়। অনেকবার কাকুতি মিনতি করলাম আমরা দু'জনেই কিন্তু মামার হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই। চড়তেই দিল না। 'ভেরি রিস্কি। অভ্যাস না থাকলে—' এই বলে নিজের পাজামা টেনে ধরল। দেখি পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুর নীচে অবধি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাদের মুখের অবস্থা দেখে ঝন্টু মামা আবার রেগে গেল, 'আজ্ঞে না মশায়, পায়ে আমার কিছুই হয়নি। এটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। বুঝলেন? শস্তার সাইকেল তৈরি করতে হলে ফ্রি হুইল ব্যবহার করা যায় না। তাই এই সাইকেলে যতক্ষণ চাকা ঘুরবে তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাডেলও ঘুরবে। সাইকেল এগোবে আর তুমি পা না নাড়িয়ে সেটি প্যাডেলে চেপে রাখবে তা হচ্ছে না। চাকা ঘুরবে, প্যাডেল ঘুরবে আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা চালাতে হবে। না হলেই ঝাঁকা। ব্রেক কষার সময় পা দুটো ফাঁক করে সরিয়ে নিতে হবে প্যাডেল থেকে, তারপর এই সুতো ধরে টান্ লাগালেই—'

পয়সা বাঁচানোই মামার উদ্দেশ্য তাই ব্রেকের সঙ্গে লোহার লিভার না জুড়ে স্রেফ সুতো দিয়েই কাজ সেরে নিয়েছেন। হ্যাণ্ডেলের নীচে সাইকেল ফ্রেমের কাছে সুতোর শেষমুখে একটা আঙটা পরানো আছে। সেলাই কলের সুতোর খালি লাটিমের গুলির ওপর দিয়ে দুটো মোড় নিয়ে সুতোটা ব্রেক-জুতোর কাছে পৌঁছেছে।

দেখতে দেখতে দমদমে এসে গেলাম। আমরা চলেছি মামার পিছনে। নয়ন ভরে দেখছি; যত দেখছি তত মুগ্ধ হচ্ছি। আমাদের শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের ভাব দেখে মামাই জানিয়েছেন যে আমরা যতটা প্রশংসা করছি তার সবটাই তাঁর একার প্রাপ্য নয়। একশো বছর আগেই এরকম বেমানান চাকার সাইকেল তৈরি হয়েছিল। লোকে বলত পেনি ফার্দিং। পেনি বলতে বড় চাকাটা বোঝাত আর ফার্দিং বলতে ছোটটা। পেনি-ফার্দিং না বলে আমরা টাকা-পয়সা বলতে পারি। তবে এটা ঠিক যে ইতিহাসের অন্ধকার ঘেঁটে ঠিক সময়মতো এই রত্নটি উদ্ধার করার কৃতিত্ব ঝন্টু মামারই প্রাপ্য।

হঠাৎ দুটো কুকুর গাঁক্ গাঁক্ করে তেড়ে এল মামার সাইকেল লক্ষ্য করে। 'মামা!'—চিৎকার করে সতর্ক করে দেবার আগেই দেখি মামা প্যাডেলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এইবার স্পীড্ টেস্ট্!'

মামার বেপরোয়া মনোভাব দেখে অবাক হইনি। সাচ্চা বৈজ্ঞানিক এমনই হয়। কিন্তু দিনরাত্তির বোয়িং ৭৪৭ দেখে অভ্যস্ত কুকুরগুলো এই নতুন ধরনের সাইকেল দেখে এত উতলা হয়ে পড়ল কেন বোঝা গেল না।

কুকুর ছুটছে, সাইকেল ছুটছে—হঠাৎ দেখা গেল সামনেই একটা হৃষ্টপুষ্ট মোষ রাস্তা পেরোতে গিয়ে একটু উদাসীন হয়ে পড়েছে। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। মামা ব্রেকের সুতোয় টান্ লাগিয়েই আর্তনাদ করে উঠলেন -'ব্রেক্ ফেল্! ধর্ ধর্—হেল্প্!'

মামা এখন প্যাডেল থেকে দু'পা সরিয়ে নিয়েছেন। কুকুরদের কামড় এড়াবার জন্য পা দুটোকে উঁচু করে রাখতে হয়েছে। সাইকেল ছুটছে টলমলিয়ে। আমরা জোরসে পা চালিয়ে মামার পাশে চলে এলাম। বিল্টু ধরল মামার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল, আমি ধরলাম সীট্। তারপরে আমরা দু'জনে ব্রেক কষতেই, তিনজনে মিলে তালগোল পাকিয়ে গড়িয়ে পড়লাম।

ঝেড়েঝুড়ে উঠে দেখলাম—ব্যাপার বেগতিক বুঝে কুকুররা ফিরে গেছে, মোষও সরে গেছে। আমাদেরও হোঁচখাট আঁচড়ের বেশি ড্যামেজ হয়নি। মামা ব্রেকের ছেঁড়া সুতোয় গিঁট বাঁধতে বাঁধতে জানালেন, 'গুরু ওস্তাগরের দোকানে খবর্দার জামা তৈরি করতে দিবি না। ও পচা সুতোয় সেলাই করে। না হলে কক্ষণো হিঁড়ত না। ওর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম এই সুতোটা।'

বারাসতে পৌঁছে শুধু চা খাবার সময় দিয়েছে ঝন্টু-মামা। মুড়ি নারকোল পুকুর ঘাটেই হবে। বিল্টুর জেঠামশাই ঠাট্টা করে বললেন, 'ওহে সায়েন্টিস্ট, নিদেন

পক্ষে একটা পুঁটিমাছ কিন্তু ধরতেই হবে। না হলে কলকাতার বদনাম।'

মামা হেসে বললেন, 'মাছ ধরাটা আমার কাছে অত ইম্পরট্যেন্ট নয়, বড় কথা হল ছিপ নিয়ে বসা।'

'সে কী!'

'চুপ করে বসে চিন্তা করার এমন সুযোগ। মনের একাগ্রতা আসে। দাবা খেলা ছেড়ে এবার থেকে মাঝে মাঝে ছিপ নিয়ে বসব ভাবছি। যতই হোক দাবা একটা বিদেশী অ্যামিউজ্‌মেন্ট।'

'হুঁ! সায়েন্টিস্ট মাছ ধরতে পারবে না তাই···' জেঠামশাইয়ের ঠোঁটের কোণের হাসি সাদা দাড়িতে ঢাকা পড়েনি।

ঝন্টুমামা গুরুজনকে সম্মান দিয়েই বললেন, 'আজ্ঞে, মাছ ধরাটা কিন্তু থিওরি অব রিলেটিভিটি আয়ত্ত করার মতো কঠিন নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই আসল কথা। এটা যার আছে তার কাছে কোন কাজই—'

জেঠামশাই 'হাবু-হাবু!' বলে হাঁক পাড়তেই খালি গায়ে কোমরে দড়ির বেল্ট আঁটা হাফপ্যান্ট-পরা একটা বছর দশকের ছেলে ছুটে এল। জেঠামশাই বললেন, 'হাবু, দাদাবাবুরা এখন মাছ ধরতে যাবে। তুই ছিপ নিয়ে যা ওদের সঙ্গে। দেখিস্—দাদাবাবুদের হাতে যেন বঁড়শি দিস্‌নি, ফুটে মুটে গেলে—'

জানা গেল আমাদের মাছ ধরার কাজে সাহায্য করার জন্যই হাবুকে আনা হয়েছে। পুঁচকে হাবুর সামনে আমাদের এমন অপমান করা হল অথচ ঝন্টুমামা কোন প্রতিবাদ করলেন না। এ কিরকম বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি! মনে মনে রাগ হচ্ছিল। ঝন্টুমামা বোধহয় সেটা আন্দাজ করেছিলেন তাই পুকুরঘাটে পৌঁছে বললেন, 'আসলে এ অঞ্চলের মাছেদের খাদ্যাভ্যাস তো আমাদের জানা নেই, তাই হাবু-ই আমাদের গাইড্ করবে।'

বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথছে দেখেই আমার গা শিউরে উঠল। পেয়ারা ডালের ছিপটা ঝন্টুমামার হাতেই আছে কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি বঁড়শিকে বর্জন করে আর সবদিকেই ঘুরছে। হাবুই টোপ সুদ্ধ বঁড়শিটাকে পুকুর জলে ছুঁড়ে দিয়ে ছিপটা আবার মামার হাতে তুলে দিল। ঝন্টুমামা মৌজ করে বসে বললেন, 'মাছ যদি থাকে তো তার নিস্তার নেই। বুঝলি সন্তু, মনে রাখিস কিন্তু, জীবনে এই আমি প্রথম ছিপ ধরছি। দেখবি কেমন এক্সপার্টের মতো কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে খেঁচকা মেরে—'

'হাই দ্যাখো—' হাবু ফাৎনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। কুপ্ কুপ্ করে খাবি খাচ্ছে। 'দাঁড়াও—দাঁড়াও, হাবু টান্ লাগাতে বারণ করল কিন্তু মামা সে কথায় কান না দিয়ে কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাগিয়ে দিল সায়েন্টিফিক্ হ্যাঁচকা। ফাৎনা ও বঁড়শি সমেত ছিপের সুতো পুকুরপাড়ে বাঁশগাছের গায়ে চড়ে বসল।

'যাঃ—গেল তো ফস্কে!' হাবু ছুটে গেল বঁড়শি ছাড়াতে।

ঝন্টুমামা বেজার হয়ে বললেন, 'ফস্কে মানে? ধরেই তো ছিলাম। টানটা জোর হয়ে গেছে বলে মাছের মুখ ছিঁড়ে বঁড়শি খুলে এল। না হলে—'

'পরের বার তাহলে অত জোরে টানবেন না। এখানকার স্থানীয় মাছেদের ঠোঁটের টিয়ারিং স্ট্রেংথ্—'

'চোপ্!' মামা বিল্টুকে থামিয়ে দিলেন। 'আমি কি ইচ্ছে করে জোরে টেনেছি! মশাটা এমন কটাস্ করে কামড় দিল মোক্ষম সময়ে! জায়গাটা যা আঁস্তাকুড় করে রেখেছে সকলে মিলে! হবে না মশা।'

মামা ছিপ ফেলে উঠে পড়ছে দেখে আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। আমাদের মুখের অবস্থা দেখে করুণা হল মামার, 'হবে হবে! ঘাবড়াচ্ছিস কেন। এবার ঘরে বসে ছিপে করে মাছ ধরব, বুঝলি? হ্যাঁ!'

মামা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আমাদের দু'জনের অবস্থা রামভক্ত হনুমানের মতো।

মামার কথায় কাজে ফারাক্ নেই। বিকেল তিনটের মধ্যে সব আয়োজন সম্পূর্ণ। একটা মোটাসোটা ফাৎনার মাথায় ছোট্ট একটা চুম্বক জুড়ে দেওয়া হয়েছে ফেভিকল দিয়ে। ফাৎনাটা এখন মাথায় চুম্বক নিয়ে পুকুর জলে ভাসছে। ফাৎনার ওপর দিয়ে যে লোহার রিঙটা গলিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা একটা গাছের ডাল থেকে সুতো বেঁধে ঝোলানো। ফাৎনার যা কিছু নাচানাচি সবই এই লোহার রিঙের ফোকরের মধ্যে। গাছের ডালটা পুকুরের জলের ওপর হাত বাড়িয়ে ঝুলে পড়েছিল বলে রিঙটা টাঙাতে খুব সুবিধে হয়েছে। লোহার রিঙটায় পাকিয়ে পাকিয়ে জড়ানো হয়েছে এনামেল-করা সরু তার। এই এনামেল-করা তারের দুটো প্রান্ত গাছের ডালে ডালে চড়ে জানলা গলে বাড়ির দোতলায় এসে ঢুকেছে। ওই-খানেই জড় হয়েছি আমরা সবাই। বিদ্যুৎ-প্রবাহ মাপার মিটারের সঙ্গে ওই তার দুটো জুড়ে দিয়েছেন ঝন্টুমামা। তার-পাকানো লোহার রিঙের মধ্যে ফাৎনার চুম্বক

এখন জলের ওপরকার মৃদু ঢেউয়ে অল্প অল্প নড়ছে এবং ওই সামান্য নড়াচড়াও ফ্যারাডের বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় আবেশের তত্ত্ব অনুসারে মিটারের কাঁটাকে এপাশ-ওপাশ কাঁপাচ্ছে। মাছ যখন টোপ্ গিলবে—ফাৎনাটা ঝটাস করে নড়ে উঠবে আর মিটারের কাঁটাও যে তখন বেজায় লাফ্ মারবে এ বিষয়ে এখন আমরা নিঃসন্দেহ। জেঠামশাই অবধি তাজ্জব। আশপাশের সব বাড়ি থেকেও লোক

করতে হয়েছে কিন্তু বিনা তারেও ব্যাপারটা করা যায়। বেতার ব্যবস্থার সাহায্যে—বুঝলি না? রেডিও শুনিস তো, তা তোর রেডিওর সঙ্গে কি রেডিও স্টেশন তার্ দিয়ে—'

ঝন্টুমামা কথা শেষ করার আগেই ঘরের মধ্যে সোরগোল। নড়েছে—ফাৎনা নড়েছে—মানে, কাঁটা নড়েছে। মামা খপ্ করে বৈদ্যুতিক চুম্বকের সুইচ্ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

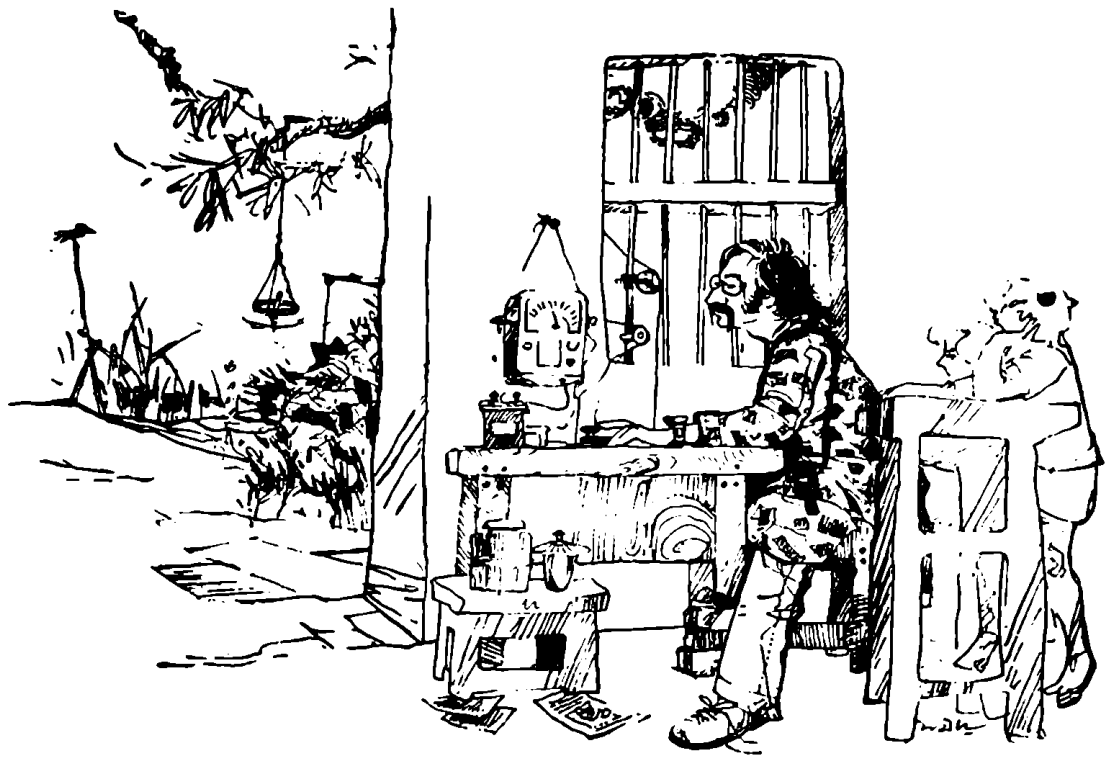

জড় হয়েছে। ছিপের সুতোটাও দু'তিনটে গাছের ডালের ওপর দিয়ে টেনে এনে দোতলার ঘরে ঢোকানো হয়েছে। যেই মিটারের কাঁটা ঝিলিক্ মারবে অমনি মামা টিপবেন সুইচ্—সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক চুম্বক জ্যান্ত হয়ে উঠে হেঁচকা টান লাগাবে লোহার আঙটায়। এই আঙটার সঙ্গেই বাঁধা আছে ছিপের সুতো। কাজেই মাছ বাবাজীর ঠোঁটে বঁড়শি না গেঁথে কোনো উপায় নেই। তারপর তো স্রেফ সুতো ধরে মারো টান্—মাছটাকে টেনে তোলা।

হাবুকে সহজ করে বোঝাচ্ছিলেন ঝন্টুমামা, 'বুঝলি—একেই বলে রিমোট কন্ট্রোল। মানে, দূরে বসেই কাজ সারা। এই যে মিটারের কাঁটা দেখছিস, এটাই এখন ফাৎনা হয়ে গেছে। আমাকে অবশ্য অনেক তার্ টানাটানি

টান্ পড়ল ছিপের সুতোয়। আমরা সবাই ঝুঁকে পড়েছি জানলা দিয়ে। ঝন্টুমামা দু'হাতে এবার ছিপের সুতো ধরে টানছেন।

আবার চিৎকার। উঠেছে—উঠেছে—পেয়ারা গাছের ডালের নীচে বঁড়শি থেকে ঝুলছে আধহাতি একটা মাছ।

এমনি সময়ে ঘটে গেল অঘটন। আমাদের চোখের সামনে একটা পুঁচকে ছোঁড়া এক্ লাফ দিয়ে বঁড়শি সমেত মাছটাকে সুতো থেকে ছিঁড়ে নিয়ে জলে পড়ল। তারপর হাঁকপাঁক করে পাড়ে উঠেই ছুট্! ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনে ঘটল কিন্তু কিছুই করা গেল না কারণ ঘটনাস্থল রিমোট্। ছেলেটার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে পালাবার সময় আবার আমাদের কলা দেখিয়ে গেল। শুধু

তাই নয়। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছি যে দুষ্কৃতকারী স্বনামধন্য হাবু। কখন যে দোতলা থেকে ভেগেছে, উত্তেজনার মধ্যে আমরা খেয়ালই করিনি।

আমরা মর্মাহত। করুর মুখে কোনো কথা নেই, হঠাৎ জেঠামশাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভো কাট্টা—ভো কাট্টা—হাবুকে বাদ দিয়ে তোমরা মাছ ধরতে গেছলে তো! কেমন কলা দেখাল!'

ইচ্ছে না থাকলেও আমি আর বিল্টু হেসে ফেলেই তারপরে ভয়ে ভয়ে তাকালাম ঝন্টুমামার দিকে। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড—ঝন্টুমামা একটুও রাগেননি। শুধু মাথা ঝাঁকাচ্ছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন, 'হবে না, হবে না, হতে পারে না—'

'কি বলছ সায়েন্টিস্ট? কি হবে না?' জেঠামশাই জিজ্ঞেস করলেন।

'বলছি—এদেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়। কি করে হবে বলুন। লোকের পেটে এত ক্ষিদে থাকলে কাজ হবে কি করে? এই যে হাবুটা—নিশ্চয় বহুদিন ওর ভাগে মাছ জোটেনি, তাই না বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর সাফল্য ওকে এতটুকু নাড়া দিল না। মাছটা ছিনিয়ে নেওয়াই বড় হয়ে উঠল।'

জীবন্ত ফসিল

প্রদীপ্ত সরকার (১৩)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী বা উদ্ভিদের শিলীভবনকে বলে ফসিল। ফসিল কি কখনও জীবন্ত হয়? হ্যাঁ হয় বৈ কি। সেই কথাই তো লিখব।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আর প্রাণীর জন্ম বহু হাজার বছর আগে হলেও আশ্চর্য উপায়ে তারা আজও বেঁচে আছে—তাদের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের চেহারা নিয়ে। এদের বলা হয় জীবন্ত ফসিল।

পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় পাওয়া গেছে একরকম ঝিনুক। প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে এদের সৃষ্টি।

গাছের জীবন্ত ফসিলও আবিষ্কৃত হয়েছে চীন ও জাপানে। গাছটির নাম "মেডেনহেয়ার।" তাদের তিরিশ কোটি বছর আগেকার চেহারা একদম পালটায়নি।

ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীর কথা অনেকেই জানেন। তবে অনেকেই জানেন না যে আজকালও ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী আছে। নিউজিল্যাণ্ডে পাওয়া গেছে টুয়াটারা নামক দুই ফুট লম্বা একপ্রকার প্রাণী। এরা ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী।

তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী এই বছরেরই আগস্ট মাসে কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে গেছেন। তাঁদের বিশ্বাস যে সেখানে ডাইনোসর জাতীয় ব্রণ্টসোরাস প্রাণীদের সন্ধান মিলবে।

সীলাকন্থ মাছের ওজন এক মণের বেশী। বিজ্ঞানীদের মতে এই মাছ ছয় কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরকম একটা মাছ ধরা পড়ল। বিজ্ঞানী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। এখন পর্যন্ত মোট পাঁচটি সীলাকন্থ মাছ পাওয়া গেছে।

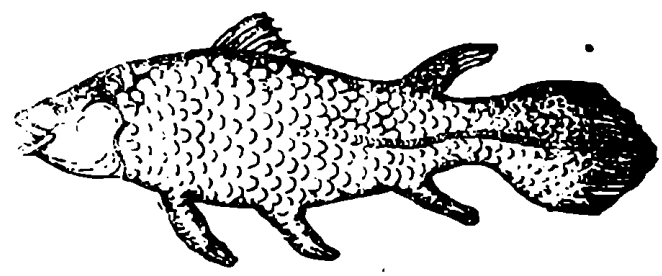

সীলাকানথ মাছ

জানি না এইরকম আরও কত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণী আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগের চেহারা নিয়ে পৃথিবী বক্ষে আবির্ভূত হবে।

কানাইলাল বিদ্যামন্দির, [অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র] চন্দননগর হুগলী।

ছোটদের দপ্তর

পরিচালক : জয়ন্ত দত্ত

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ-সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার' প্রশ্নের উত্তর চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই।

প্রশ্নের সংগে তোমরা নিজেদের বয়স কিন্তু উল্লেখ করবে।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম :

সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেনি। প্রকাশিত উত্তরগুলি দেখে নেবে।

দশ বা তার বেশী প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম : রামু সাহা—বরাকর, বর্ধমান ; মানস রায়চৌধুরী—শিবপুর, হাওড়া ; দেবাশীষ কুণ্ডু, অরূপ দত্ত, খোঁড়া (নম্)—দুর্গাপুর, বর্ধমান ; রাজশ্রী বসু—শাঁখারিপুকুর, বর্ধমান ; প্রবীর মুখোপাধ্যায়—ধামাই, বীরভূম ; লাইনুল নাহার (লীনা), নাজমুন নাহার (পলি)—নলহাটি, বীরভূম ; দিলীপকুমার ঘোষ—বাঁকুড়া ; সোমা সিংহ—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ; প্রদ্যোৎ-কুমার হাতি—আমলাগোড়া, মেদিনীপুর ; অঞ্জনা হাজরা—সালুয়া, মেদিনীপুর ; জয়দীপ চন্দ্র—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; প্রিয়া চ্যাটার্জী—জয়পুর, মুর্শিদাবাদ ; সন্দীপন মুখোপাধ্যায়—রাইঘাটাং চা বাগান, জলপাইগুড়ি ; জয়জিৎ লাহিড়ী—রায়কট পাড়া, জলপাইগুড়ি ; বিকাশ বিশ্বাস, জয়নাথ সরকার—নদীয়া, পল্লব মোহান্ত—পলাশীপাড়া, নদীয়া ; মহঃ নোমান আনসারী—জলপাইগুড়ি ; জয়দেব দালাল—গুড়াপ, হুগলী ; পার্থপ্রতিম পাল—শেওড়াফুলি, হুগলী ; নেপালচন্দ্র মাল—বেড়াবেড়ী, হুগলী ; সুব্রত চৌধুরী—ডানকুনি, হাওড়া ; সুব্রত গোস্বামী—খুরুট, হাওড়া ; সুমিতা চৌধুরী—নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা ; মোহন চ্যাটার্জী—শ্যামনগর, ২৪-পরগনা ; জয়দীপ ভট্টাচার্য—কলকাতা, দেওয়ান ফারুক—কলকাতা-৩৯ ; দীপাঞ্জন মিত্র—লেকটাউন, কলকাতা ; ইন্দ্রনীল ঘোষ—কলকাতা ; রত্নশ্রী ভট্টাচার্য—কলকাতা ; বিশ্বজিৎ ভৌমিক ও তপন সাহা—সুগন্ধ্যা, হুগলী।

প্রশ্ন-উত্তর

প্রঃ চাঁদে কে প্রথম গিয়েছিলেন ?
শান্তনু দাস—(১০) গড়িয়া, ২৪-পরগনা

উঃ নীল আর্মস্ট্রং ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় সকাল ৮ ঘঃ ২৬ মিঃ ২০ সেঃ। এর কুড়ি মিনিট পরে নামেন অলড্রিন।

প্রঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম সংখ্যাটি কত সালে এবং কি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল ?
শ্রীশচীন্দ্রনাথ সরদার—তেগাছি, ২৪-পরগনা

উঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম সংখ্যাটি ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮১তে ছাপা হয়েছিল।

প্রঃ এডিশন কি কি আবিষ্কার করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।
সুদীপ মজুমদার—যাদবপুর, কলকাতা

উঃ তোমার জানবার আকাঙ্ক্ষা এবারের সংখ্যাই পূরণ করবে।

প্রঃ (ক) ডালটন কিসের একক ?
(খ) ক্রোমানিমা কি ?
(গ) ৫৫ লাইটে যে কোষ থাকে তাহা কিছুদিন ব্যবহারের পর নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সঞ্চয়ক কোষ এই ভাবে কিছুদিন ব্যবহারের পর নষ্ট হয় না কেন ?
বাসুদেব ঘোষ—দমদম, কলিকাতা

উঃ ক) ডালটন—অ্যাটমিক মাস্ ইউনিটকে ডালটনও বলা হয়।

("An arbitrarily defined unit in terms of which the masses of individual atoms are expresse; the standard is the unit of mass equal to $\frac{1}{12}$ the mass of the carbon atom, having as nucleus. The isotope with mass number 12."—Mcgraw Hill Dictionary of Science & Technology)

শেষাংশ ৫৪ পাতার ২য় কলমে

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্র কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

২। ট্র্যাক্টর আবিষ্কার করেন কে?

৩। উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে কোন্ হর্মোন?

৪। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ভাষায় ভুট্টার নাম কি?

৫। 'ক্যাভিট্রন' কি?

৬। বৃহস্পতি গ্রহের কয়টি উপগ্রহ আছে?

৭। 'ক্লোরল' নামক জৈব যৌগটির আবিষ্কর্তা কে?

৮। ISRO কথার অর্থ কি?

৯। হ্যালির ধূমকেতু কতো বৎসর অন্তর দেখা যায়?

১০। হ্যালির ধূমকেতু শেষবার কবে দেখা গেছে?

১১। কোন্ পাখির দেহ থেকে বর্জিত পদার্থ 'গুয়ানো' কৃষিকাজে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

১২। 'সিগমণ্ড ফ্রয়েড' কে ছিলেন?

১৩। তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের সূত্র আবিষ্কার করেন কে?

১৪। কোন্ পতঙ্গ প্লেগ রোগের বাহক?

১৫। 'পোলিও' কি ধরনের রোগ?

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। সেলম্যান. এ. ওয়াক্সম্যান।

২। রেডিয়াম-এর প্রতীক Rh.

৩। আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত 'টলুইন' নামক জৈব যৌগটি স্যাকারিনের উৎস। ৪। লিথোস্ফিয়ার।

৫। স্বভাবতঃ নীল রঙের এক রকম উদ্ভিজ্জ পদার্থ, জলে দ্রাব্য। অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল লিটমাসের রং লাল হয় এবং ক্ষারের সংস্পর্শে পুনরায় তা নীল হয়।

৬। মিরিয়াপড।

৭। চোখের স্বল্প দূরত্বের দৃষ্টি দোষ বা মাইয়োপিয়া (শর্ট সাইট্) অর্থাৎ চোখের যে ত্রুটির ফলে কাছের জিনিস দেখা যায় কিন্তু দূরের জিনিস ভাল দেখা যায় না—সেই রকম দৃষ্টি দোষ সংশোধিত হয় অবতল লেন্সের চশমা দ্বারা। ৮। 'মাইক্রো' শব্দের অর্থ অতি ক্ষুদ্র।

৯। 'ভিটামিন-সি' এর অভাবে মানুষের 'স্কার্ভি' রোগ হয়।

১০। কাঁসা হলো তামা ও টিনের সংকর ধাতু। এর মধ্যে তামার ভাগ 60% থেকে 85% পর্যন্ত থাকতে পারে।

১১। শৈবাল শ্রেণীর এক জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ হলো 'ফার্ন'। ১২। ফটোমিটার।

১৩। পিচ ব্লেণ্ড। এটি প্রধানতঃ ইউরেনিয়াম অক্সাইডের একটি খনিজ পদার্থ [U_3O_8]

১৪। সোনা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম ধাতুকে সম্ভ্রান্ত ধাতু বলা হয়।

১৫। থোরিয়াম ধাতুর অক্সাইড [ThO_2] গ্যাস ম্যান্টেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞানের শব্দকূট

স্বাতী রায়

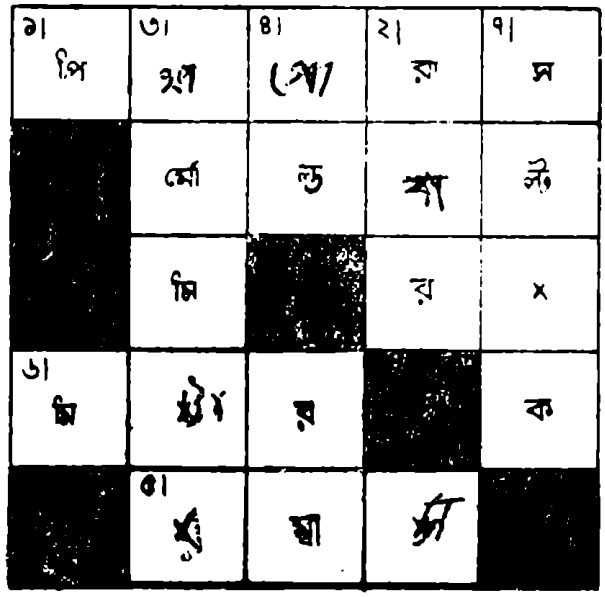

পাশাপাশি :

১। গ্রীক দার্শনিক

৫। যে জ্যামিতিক সামন্তরিক চতুর্ভুজের বাহুগুলি সব পরস্পর সমান, কিন্তু কোনও কোণই সমকোণ নয়।

৬। মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একটি একক।

উপর-নীচে :

২। এক বিশেষ উদ্ভিদের সাদা রস ঘনীভূত হ'য়ে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়।

৩। তাপমান যন্ত্র।

৪। একটি সম্ভ্রান্ত ধাতু।

৭। অবিশুদ্ধ সোদক সোডিয়াম সালফেট; জমাট বাঁধা স্ফটিকাকার পদার্থ।

(সমাধান : পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে)

ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

শ্রীসহদেব ভট্টাচার্য

আমাদের কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনস্ (Botanical Gardens)। বোটানিক্যাল গার্ডেনস্ হুগলী নদীর ধারে অবস্থিত। হাওড়ার শিবপুরে এই উদ্যানটি ১৭৮৭ সালে ৭ই জুলাই কর্নেল কীড নামে জনৈক [redacted] অফিসার প্রতিষ্ঠা করেন। কীড সাহে[redacted] এই বাগানে কিছু গাছ গাছড়ার আবাদ করা যা দুর্ভিক্ষের সময় বা খাদ্যাভাবের সময় সাধারণের বিকল্প খাদ্যের সহায়ক হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ উদ্যান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে কর্নেল কীড ১৭৯৩ সালে পরলোক গমন করেন। এরপর এল "ভারতীয় উদ্ভিদ বিদ্যার জনক ও পথিকৃৎ" বলে খ্যাত ডঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ। ডঃ রক্সবার্গের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এই বাগানের পরিচিতি ঘটল। বিশ্বের অপরাপর বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির সাথে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এ বাগান একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বর্তমানে কীড সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শিবপুর উদ্যানটি আমাদের "ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে" পরিণত হয়েছে। গত ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী এই উদ্যান ভারত সরকারের অধীনে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার (Botanical Survey of India) সঙ্গে যুক্ত হয়। এ উদ্যানে রয়েছে সারা বিশ্বের নানারকম গাছপালার সমাবেশ। এর মধ্যে যেমন বহু গাছ আমাদের চেনা-জানা, তেমনি বহু গাছ আমাদের অচেনা অজানা। এই অচেনা অজানা গাছের অনেক গাছই অত্যন্ত দুর্লভ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষকরা তাঁদের গবেষণার জন্যে এই উদ্যানে যত রকমের গাছ একসঙ্গে পান তেমনটি আর ভারতের কোথাও পাওয়া যায় না।

পাট, কার্পাস, শিমুল, চা, কফি, সিঙ্কোনা ইত্যাদি অনেক রকমের অর্থকরী ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ আমাদের এই ভারতে এসেছে এই ভারতীয় উদ্যানের মাধ্যমেই।

এ উদ্যানে প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে বহু নূতন নূতন বৃক্ষের বীজ ও চারা আমদানী করা হয়। এখানকার উদ্ভিদবিদগণ নানা প্রকার উদ্ভিদ উদ্ভাবনের পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্য করে চলেছেন। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রচনার ক্ষেত্রেও নূতন গাছ গাছড়ার চাষ-আবাদ ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্য ও উপদেশ এখান থেকে পাওয়া যায়। গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের সুবিধার জন্য এখানে একটি মূল্যবান 'লাইব্রেরী' (Library) আছে। সেখানে প্রায় ৪০ হাজারের মত গাছ-গাছড়ার উপর লেখা বই আছে।

বর্তমানে এই উদ্যানে গড়ে উঠেছে ভাবীকালের জন্য [redacted] উদ্ভিদের শুষ্ক নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র। এ ছাড়া এখানে আছে অন্যান্য বনজ উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণাগার।

এখানে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, অসিনাম কিলিমানজা কেরিকাম (Osinum Kilimaja Caricum) নামক এক প্রকার আফ্রিকা দেশীয় বন-তুলসী, কর্পূর ও কর্পূর তেলের প্রধান উৎস। সাধারণতঃ গাছের পাতা থেকে এগুলি নিষ্কাশন করা হয়। রাওলফিয়া সারপেনটি (Rauwolfia Cerpenty) বা সর্পগন্ধা গাছ ভারতীয় ঔষধি শাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই গাছের মূল থেকে প্রাপ্ত উপক্ষার অধিক রক্তচাপের বিশিষ্ট ঔষধ। গাছের পুষ্পস্তবককে প্রথমাবস্থাতেই বিনষ্ট করে মূলে উপক্ষারের (Alkoloid) পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে 'কালমেঘ' (Kalmegh) নামে একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। এই উদ্ভিদ মানুষের উপকারী বনৌষধি। এর থেকে কালমেঘ সালসা (Kalmegh Salsa) নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে উৎপন্ন হয় মহীরুহ। এর অন্তরালে যে সব জৈব উত্তেজকের প্রভাব আছে তার অনেক তথ্যই এখানকার গবেষণায় জানা গেছে।

এছাড়া গাছের উত্তেজক রস প্রয়োগে বিভিন্ন বনৌষধির উন্নতি ও বৃদ্ধি করা গেছে। এই বাগানে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ বা Germ Plasm Bank বর্তমানে আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই বাগান ভারতীয় অবদান অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ঠাকুরানী চক, হুগলী।

ভেবে বলো

শুভব্রত রায় চৌধুরী

(১) নীচের ছবিতে একটা লম্বা দাঁতওয়ালা জন্তুকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের খুব পরিচিত—এর নামটি ভেবে বলো।

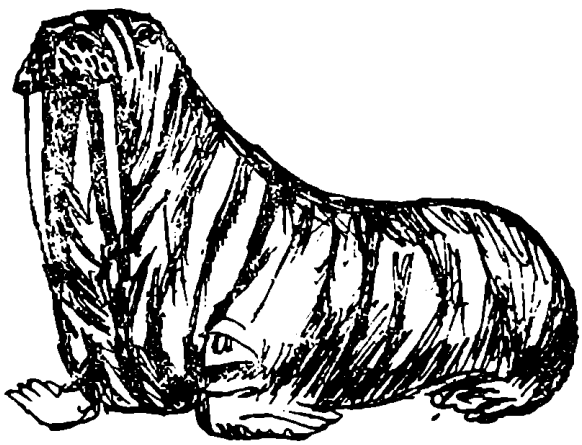

(২) শরীর সংরক্ষণে আয়োডিনের কাজ কি?

(৩) কোনটি ঠিক বলো : খোরানার নাম যুক্ত আছে.
(ক) রক্ত প্রবাহ সম্পর্কে; (খ) কৃত্রিম জিন সম্পর্কে
(গ) পচন নিবারক সার্জারী সম্বন্ধে।

(৪) এনজাইম কি জাতীয় জটিল রাসায়নিক পদার্থ :
(ক) স্নেহ জাতীয় (খ) লবণ জাতীয়; (গ) প্রোটিন জাতীয়।

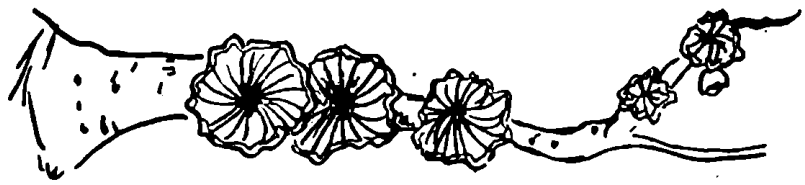

(৫) এক ধরনের উদ্ভিদকে উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। এর নাম বলো।

(৬) নীচে বসে আছে ওটা কি মানুষ না বনমানুষ? এর নামটি কি?

(৭) 'সেফ্‌টি ম্যাচ' (SAFETY MATCH) কে আবিষ্কার করেন?

(৮) ছত্রাকের দেহের কোষপ্রাচীর কি দিয়ে গঠিত
(ক) কাইটিন; (খ) সেলুলোজ (গ) পেকটোজ।

(৯) ১৮৬৩ সালের ২রা আগস্ট কোন্ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন?

(১০) পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুটো প্রাণী। এদের নাম বলতে পারো?

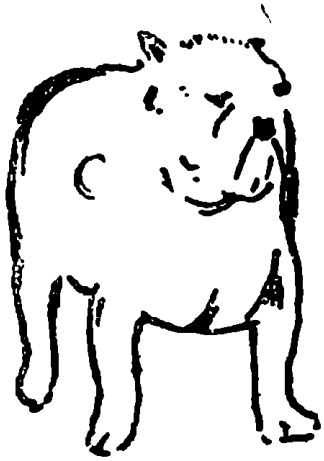

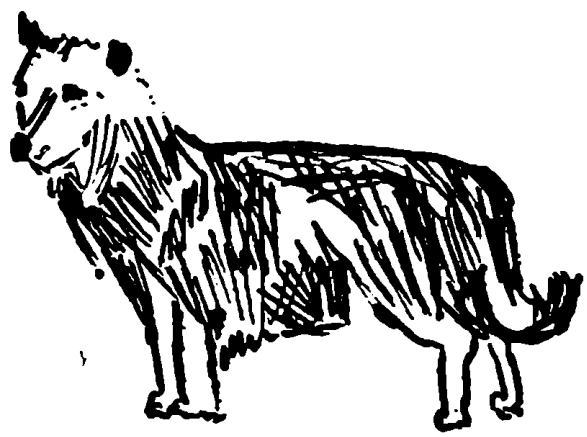

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

রচনা প্রতিযোগিতা

মান: ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার ২৫৲ দ্বিতীয় ২০৲ তৃতীয় ১৫৲

বিষয় সূচী

ষষ্ঠ শ্রেণী: পরিচিত পাখি ॥ শব্দসংখ্যা ২৫০

সপ্তম শ্রেণী: প্রিয় বিজ্ঞানী ॥ শব্দসংখ্যা ৩০০

অষ্টম শ্রেণী: গাছের মূল্য ॥ শব্দসংখ্যা ৪০০

নিয়মাবলী

[এক] মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

[দুই] নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

[তিন] প্রেরিত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না। পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ:—৩১শে মার্চ ১৯৮২

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রতিযোগীর নাম: .....বয়স.....

ঠিকানা: .....

.....

বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা: .....

.....

শ্রেণী.....রচনার বিষয়.....

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর.....

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

করে দেখ মজা পাবে

[কর্পূরের জাহাজ]

দেবাশিস কর্মকার

সমুদ্রে যে সব বড়ো বড়ো জাহাজ চলে তার সঙ্গে আমাদের এই জাহাজের কোনো মিল নেই। এটা জলে ছেড়ে দিলেই আপনা হতে চলবে।

এই মজার জাহাজটা বানাতে আমাদের লাগবে মাত্র তিনটি জিনিস—

১। এক টুকরা অভ্র ২। এক টুকরা কর্পূর

৩। এক গামলা জল

১নং ছবি

২নং ছবি

প্রথমে একটা কাঁচি দিয়ে অভ্রটাকে ত্রিভুজের মতো করে কেটে ফেল এবং তার কথ অংশে একটু কোণ করে কেটে ফেল (1নং ছবি)। এবার ঐ কাটা জায়গায় কর্পূরের টুকরোটা বসিয়ে দাও। এবার ওটাকে গামলার জলে ভাসিয়ে দাও দেখবে কেমন তর তর করে এগোবে তোমার জাহাজ।

নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়, নবদ্বীপ, নদীয়া।

৫০ পাতার শেষাংশ

খ) ক্রোমোনিমা (Chromonema)—"The whole of the threads which make up nuclear reticulum: one of the threads; a twisted chromotic thread within the chromosome." —Chambers' Dictionary of Science & Technology. এবার আশা করি আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না কারণ cytology সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে Chromonema শব্দটির সম্বন্ধে আপনি কৌতূহলী হতেন না।

গ) টর্চ লাইটের ব্যাটারির মতো সঞ্চয়ক কোষও কিছুদিন ব্যবহারের পর নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি সময় মতো সঞ্চয়ক কোষকে 'চার্জ' করা না হয়। 'চার্জ' করা মানে সঞ্চয়ক কোষ থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোষে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে কোষের রাসায়নিক শক্তি নবীকরণ। টর্চ লাইটের কোষ-কে এইভাবে চার্জ করা সম্ভব নয়। তবে সঞ্চয়ক কোষও কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, তারও আয়ত্ত নির্দিষ্ট।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লেখা

পৃথিবীর ইতিহাস (আধুনিক যুগ) [অষ্টম শ্রেণী]
অধ্যাপক রতীশচন্দ্র মুখার্জী
[Submission No. Syll/VIII/H/81/3]

জীবনবিজ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) [৭ম শ্রেণী]
ডঃ সত্যকিঙ্কর পাল
[Submission No. Syll/VII/L.S/81/123]

জীবনবিজ্ঞান (প্রথম ভাগ) [ষষ্ঠ শ্রেণী]
ডঃ সত্যকিঙ্কর পাল
[Submission No. Syll/L.S/VI/80/129]

ভূগোল পরিচয় [অষ্টম শ্রেণী]
ডঃ অরবিন্দ বিশ্বাস ও দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী
T. B. No. Syll/Ce/VIII/81/41]

মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন [নবম/দশম]
ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী

ভৌত বিজ্ঞান [৭ম শ্রেণী]
ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী

ব্যাকরণ পরিচর [ষষ্ঠ/৭ম-৮ম]
জ্যোতিভূষণ চাকী

রচনা পরিচয় [৭ম/৮ম] জ্যোতিভূষণ চাকী

প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ ও রচনাবিধি [৯ম/১০ম] জ্যোতিভূষণ চাকী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

Principal Amiyobhuson Chakraborty প্রণীত :

Simple English Grammar, Composition and Translation [VII VIII]

Practical English Grammar Translation and Composition [IX-X]

মানব সভ্যতা (মধ্যযুগ) [৭ম শ্রেণী]
ডঃ সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত
[T. B. No. VII/H/81/43]

General Editors: Profs. Chakraborty & Chattarjee কৃত

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট অর্থপুস্তক

Notes on English Frose & Verse (*Selections*)

Notes on পাঠ-সংকলন
Sure Sucuss Sereis :

Profs Chakravarty & Chattarjee কৃত :

Sure Sucess in ENGLISH * বাংলা * পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন * ভূগোল * ইতিহাস * জীবনবিজ্ঞান * অঙ্ক * সংস্কৃত

আমরা মুক্তধারা (বাংলাদেশ) প্রকাশিত শিশু ও কিশোর সাহিত্যের প্রায় ২৫০ খানা বইয়ের ভারতে প্রধান পরিবেশক

পুথিপত্র

৯, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
অমাবস্যা পূর্ণিমায় পৃথিবী চাঁদ ও সূর্য এক রেখায় দাঁড়ালে জোয়ার হয়। গঙ্গার জল বাড়ে।
আজ পূর্ণিমা বলে জ্বরটা একটু বেড়েছে।
পূর্ণিমার পূজার বাজার, তাই বাজারে জিনিস-পত্রের দাম বেশ বেড়েছে।
পূর্ণিমা! অমাবস্যা! সব বেড়েছে!
স্যারের মুখটা অমাবস্যা।
রাগটাও জোয়ারের মত বেড়েছে যেন।
পড়ার চাপ যা বেড়েছে সামলানো কঠিন। তাই পালিয়ে এলাম।
ওঃ! এক গাদা বইয়ের পড়া! সারারাত জেগেছি।
ওটা কি বই রে? ডিক্সনারী?
এটা পাঁজি! পণ্ডিত মশাইকে দেখাবো আজ পূর্ণিমা না অমাবস্যা।

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ছোটদের বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তেপান্তর ১৫·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ছোটদের কাশীনাথ ৬·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ১৫·০০
অপুর ছেলেবেলা ৬·০০
ছোটদের অপরাজিত ৬·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদার জুড়ি নেই ৫·০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫·০০
ঘনাদা বিচিত্রা ১৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ১৫·০০
চারমূর্তি ৫·০০
ঝাউবাংলোর রহস্য ৫·০০
কম্বল নিরুদ্দেশ ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হাতিচোর ৬·০০

সুজিতকুমার নাগ
কিশোর রচনাসমগ্র ১০·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কায়াহীনের কবলে ৪·০০
হট যাও হার্মাদ ৫·০০

শিশির ঘোষ
লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬·০০

ধীরেন বল
হাস্যকর ৫·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়
যখের আসন ৬·০০

স্যার কোনান ডয়েল
কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭·০০
কিশোর রহস্য গল্প ৭·০০

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী
গুপী গাইন বাঘা বাইন ৫·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধর
দুরন্ত যাত্রী ৮·০০

ছোটদের বই

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা।

প্রচ্ছদমুদ্রণ: রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২